মার্‌য়াম

১৯

নামকরণ

وَاذْكُرْ فِى الْكِتٰبِ مَرْيَمَ আয়াত থেকে সূরাটির নাম গ্রহণ করা হয়েছে। এর মানে হচ্ছে, এমন সূরা যার মধ্যে হযরত মার্‌য়ামের কথা বলা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

হাবশায় হিজরাতের আগেই সূরাটি নাযিল হয়। বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য হাদীস থেকে জানা যায়, মুসলিম মুহাজিরদেরকে যখন হাবশার শাসক নাজ্জাশীর দরবারে ডাকা হয় তখন হযরত জাফর দরবারে উপস্থিত হয়ে এ সূরাটি তেলাওয়াত করেন।

ঐতিহাসিক পটভূমি

যে যুগে এ সূরাটি নাযিল হয় সে সময়কার অবস্থা সম্পর্কে সূরা কাহফের ভূমিকায় আমি কিছুটা ইংগিত করেছি। কিন্তু এ সূরাটি এবং এ যুগের অন্যান্য সূরাগুলো বুঝার জন্য এতটুকু সংক্ষিপ্ত ইংগিত যথেষ্ট নয়। তাই আমি সে সময়ের অবস্থা একটু বেশী বিস্তারিত আকারে তুলে ধরছি।

কুরাইশ সরদাররা যখন ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে, লোভ-লালসা দেখিয়ে এবং ভয়-ভীতি ও মিথ্যা অপবাদের ব্যাপক প্রচার করে ইসলামী আন্দোলনকে দমাতে পারলো না তখন তারা জুলুম-নিপীড়ন, মারপিট ও অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করার অস্ত্র ব্যবহার করতে লাগলো। প্রত্যেক গোত্রের লোকেরা নিজ নিজ গোত্রের নওমুসলিমদেরকে কঠোরভাবে পাকড়াও করতে থাকলো। তাদেরকে বন্দী করে, তাদের ওপর নানাভাবে নিপীড়ন নির্যাতন চালিয়ে, তাদেরকে অনাহারে রেখে এমনকি কঠোর শারীরিক নির্যাতনের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত করে ইসলাম ত্যাগ করার জন্য বাধ্য করার প্রচেষ্টা চালাতে থাকলো। এ নির্যাতনে ভয়ংকরভাবে পিষ্ট হলো বিশেষ করে গরীব লোকেরা এবং দাস ও দাসত্বের বন্ধনমুক্ত ভৃত্যরা। এসব মুক্তিপ্রাপ্ত গোলাম কুরাইশদের আশ্রিত ও অধীনস্থ ছিল। যেমন বেলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু, আমের ইবনে ফুহাইরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু, উম্মে 'উবাইস রাদিয়াল্লাহু আনহু, যিন্নীরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু, আম্মার ইবনে ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তাঁর পিতামাতা প্রমুখ সাহাবীগণ। এদেরকে মেরে মেরে আধমরা করা হলো। কক্ষে আবদ্ধ করে খাদ্য ও পানীয় থেকে বঞ্চিত করা হলো। মক্কার প্রখর রৌদ্রে উত্তপ্ত বালুকারাশির ওপর তাদেরকে শুইয়ে দেয়া হতে থাকলো। বুকের ওপর প্রকাণ্ড পাথর চাপা অবস্থায় সেখানে তারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাতরাতে থাকলো। যারা

পেশাজীবী ছিল তাদেরকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিয়ে পারিশ্রমিক দেবার ব্যাপারে পেরেশান করা হতে থাকলো। বুখারী ও মুসলিমে হযরত খাব্বাব ইবনে আরত রাদিয়াল্লাহু আনহুর রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে ঃ

"আমি মক্কায় কর্মকারের কাজ করতাম। আস ইবনে ওয়ায়েল আমার থেকে কাজ করিয়ে নিল। তারপর যখন আমি তার কাছে মুজরী আনতে গেলাম, সে বললো, যতক্ষণ তুমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অস্বীকার করবে না ততক্ষণ আমি তোমার মুজরী দেবো না।"

এভাবে যারা ব্যবসা করতো তাদের ব্যবসা নষ্ট করার প্রচেষ্টা চালানো হতো। যারা সমাজে কিছু মান-মর্যাদার অধিকারী ছিল তাদেরকে সর্বপ্রকারে অপমানিত ও হেয় করা হতো। এ যুগের অবস্থা বর্ণনা প্রসংগে হযরত খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কা'বার ছায়ায় বসেছিলেন। আমি তাঁর কাছে গিয়ে বললাম, "হে আল্লাহর রসূল! এখন তো জুলুম সীমা ছাড়িয়ে গেছে, আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করেন না ?" একথা শুনে তাঁর পবিত্র চেহারা লাল হয়ে গেলো। তিনি বললেন, তোমাদের পূর্ববর্তী মু'মিনদের ওপর এর চেয়ে বেশী জুলুম নিপীড়ন হয়েছে। তাদের হাড়ের ওপর লোহার চিরুনী চালানো হতো। তাদেরকে মাথার ওপর করাত রেখে চিরে ফেলা হতো। তারপরও তারা নিজেদের দীন ত্যাগ করতো না। নিশ্চিতভাবে জেনে রাখো, আল্লাহ এ কাজটি সম্পন্ন করে ছাড়বেন, এমনকি এমন এক সময় আসবে যখন এক ব্যক্তি সান'আ থেকে হাদারামাউত পর্যন্ত নিশ্চিন্তে সফর করবে এবং তার আল্লাহ ছাড়া আর কারোর ভয় থাকবে না। কিন্তু তোমরা তাড়াহুড়া করছো।"—বুখারী

এ অবস্থা যখন সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেলো তখন ৪৫ হস্তী বর্ষে (৫ নববী সন) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীদের বললেন ঃ

لَوْ خَرَجْتُمْ اِلَى اَرْضِ الْحَبْشَةِ فَاِنَّ بِهَا مَلِكًا لاَيُظْلَمُ عِنْدَهُ اَحَدٌ وَهِىَ اَرْضُ صِدْقٍ حَتَّى يَجْعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ فَرَجًا مِمَّا اَنْتُمْ فِيْهِ ـ

"তোমরা হাবশায় চলে গেলে ভালো হয়। সেখানে এমন একজন বাদশাহ আছেন যার রাজ্যে কারো প্রতি জুলুম হয় না। সেটি কল্যাণের দেশ। যতদিন পর্যন্ত না আল্লাহ তোমাদের এ বিপদ দূর করে দেন ততদিন তোমরা সেখানে অবস্থান করবে।"

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ বক্তব্যের পর প্রথমে এগারোজন পুরুষ ও চারজন মহিলা হাবশার পথে রওয়ানা হন। কুরাইশদের লোকেরা সমুদ্র উপকূল পর্যন্ত তাদের ধাওয়া করে যায়। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে শু'আইবা বন্দরে তাঁরা যথাসময়ে হাবশায় যাওয়ার নৌকা পেয়ে যান। এভাবে তারা গ্রেফতারীর হাত থেকে রক্ষা পান। তারপর কয়েক মাস পরে আরো কিছু লোক হিজরত করেন। এভাবে ৮৩জন পুরুষ, ১১জন মহিলা ও ৭জন অ-কুরাইশী মুসলমান হাবশায় একত্র হয়ে যায়। এ সময় মক্কায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মাত্র ৪০জন মুসলমান থেকে গিয়েছিলেন।

এ হিজরতের ফলে মক্কার ঘরে ঘরে কান্নাকাটি শুরু হয়ে যায়। কারণ কুরাইশদের ছোট বড় পরিবারগুলোর মধ্যে এমন কোনো পরিবারও ছিল না যার কোনো একজন এ মুহাজিরদের দলভুক্ত ছিল না। কারোর ছেলে, কারোর জামাতা, কারোর মেয়ে, কারোর ভাই এবং কারোর বোন এ দলে ছিল। এ দলে ছিল আবু জেহেলের ভাই সালামাহ ইবনে হিশাম, তার চাচাত ভাই হিশাম ইবনে আবী হুযাইফা ও আইয়াশ ইবনে আবী রাবী'আহ এবং তার চাচাত বোন হযরত উম্মে সালামাহ, আবু সুফিয়ানের মেয়ে উম্মে হাবীবাহ, উত্‌বার ছেলে ও কলিজা ভক্ষণকারিণী হিন্দার সহোদর ভাই আবু হুযাইফা এবং সোহাইল ইবনে আমেরের মেয়ে সাহ্‌লাহ। এভাবে অন্যান্য কুরাইশ সরদার ও ইসলামের সুপরিচিত শত্রুদের ছেলে মেয়েরা ইসলামের জন্য স্বগৃহ ও আত্মীয় স্বজনদের ত্যাগ করে বিদেশের পথে পাড়ি জমিয়েছিল। তাই এ ঘটনায় প্রভাবিত হয়নি এমন একটি গৃহও ছিল না। এ ঘটনার ফলে অনেক লোকের ইসলাম বৈরিতা আগের চেয়ে বেড়ে যায়। আবার অনেককে এ ঘটনা এমনভাবে প্রভাবিত করে যার ফলে তারা মুসলমান হয়ে যায়। উদাহরণ স্বরূপ হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইসলাম বৈরিতার ওপর এ ঘটনাটিই প্রথম আঘাত হানে। তাঁর একজন নিকটাত্মীয় লাইলা বিনতে হাশ্‌মাহ বর্ণনা করেন ঃ আমি হিজরত করার জন্য নিজের জিনিসপত্র গোছগাছ করছিলাম এবং আমার স্বামী আমের ইবনে রাবী'আহ কোনো কাজে বাইরে গিয়েছিলেন। এমন সময় উমর এলেন এবং দাঁড়িয়ে আমার ব্যস্ততা ও নিমগ্নতা দেখতে থাকলেন। কিছুক্ষণ পর বললেন ঃ "আবদুল্লাহর মা! চলে যাচ্ছো ?" আমি বললাম, "আল্লাহর কসম! তোমরা আমাদের অনেক কষ্ট দিয়েছো। আল্লাহর পৃথিবী চারদিকে উন্মুক্ত, এখন আমরা এমন কোনো জায়গায় চলে যাবো যেখানে আল্লাহ আমাদের শান্তি ও স্থিরতা দান করবেন।" একথা শুনে উমরের চেহারায় এমন কান্নার ভাব ফুটে উঠলো, যা আমি তার মধ্যে কখনো দেখিনি। তিনি কেবল এতটুকু বলেই চলে গেলেন যে, "আল্লাহ তোমাদের সহায় হোন।"

হিজরতের পরে কুরাইশ সরদাররা এক জোট হয়ে পরামর্শ করতে বসলো। তারা স্থির করলো, আবদুল্লাহ ইবনে আবী রাবী'আহ (আবু জেহেলের বৈপিত্রেয় ভাই) এবং আমর ইবনে আসকে মূল্যবান উপঢৌকন সহকারে হাবশায় পাঠাতে হবে। এরা সেখানে গিয়ে এ মুসলমান মুহাজিদেরকে মক্কায় ফেরত পাঠাবার জন্য হাবশার শাসনকর্তা নাজ্জাশীকে সম্মত করাবে। উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা (নিজেই হাবশার মুহাজিরদের দলভুক্ত ছিলেন) এ ঘটনাটি বিস্তারিত আকারে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ কুরাইশদের এ দু'জন কূটনীতি বিশারদ দূত হয়ে আমাদের পিছনে পিছনে হাবশায় পৌঁছে গেলো। প্রথমে নাজ্জাশীর দরবারের সভাসদদের মধ্যে ব্যাপকহারে উপঢৌকন বিতরণ করলো। তাদেরকে এ মর্মে রাযী করালো যে, তারা সবাই মিলে একযোগে মুহাজিরদেরকে ফিরিয়ে দেবার জন্য নাজ্জাশীর ওপর চাপ সৃষ্টি করবে। তারপর নাজ্জাশীর সাথে সাক্ষাত করলো এবং তাকে মহামূল্যবান নযরানা পেশ করার পর বললো, "আমাদের শহরের কয়েকজন অবিবেচক ছোকরা পালিয়ে আপনার এখানে চলে এসেছে। জাতির প্রধানগণ তাদেরকে ফিরিয়ে নেবার আবেদন জানাবার জন্য আপনার কাছে আমাদের পাঠিয়েছেন। এ ছেলেগুলো আমাদের ধর্ম থেকে বের হয়ে গেছে এবং এরা আপনাদের ধর্মেও প্রবেশ করেনি বরং তারা একটি অভিনব ধর্ম উদ্ভাবন করেছে।" তাদের কথা শেষ হবার সাথে সাথেই দরবারের চারদিক থেকে একযোগে আওয়াজ গুঞ্জরিত হলো,

"এ ধরনের লোকদেরকে অবশ্যই ফিরিয়ে দেয়া উচিত। এদের দোষ সম্পর্কে এদের জাতির লোকেরাই ভালো জানে। এদেরকে এখানে রাখা ঠিক নয়।" কিন্তু নাজ্জাশী রেগে গিয়ে বললেন, "এভাবে এদেরকে আমি ওদের হাতে সোপর্দ করে দেবো না। যারা অন্যদেশ ছেড়ে আমার দেশের প্রতি আস্থাস্থাপন করেছে এবং এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছে তাদের সাথে আমি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারি না। প্রথমে আমি এদেরকে ডেকে এ মর্মে অনুসন্ধান করবো যে, ওরা এদের ব্যাপারে যা কিছু বলছে সে ব্যাপারে আসল সত্য ঘটনা কি!" অতপর নাজ্জাশী রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীদেরকে নিজের দরবারে ডেকে পাঠালেন।

নাজ্জাশীর বার্তা পেয়ে মুহাজিরগণ একত্র হলেন। বাদশাহর সামনে কি বক্তব্য রাখা হবে তা নিয়ে তারা পরামর্শ করলেন। শেষে সবাই একজোট হয়ে ফায়সালা করলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের যে শিক্ষা দিয়েছেন তাই হুবহু কোনো প্রকার কমবেশী না করে তাঁর সামনে পেশ করবো, তাতে নাজ্জাশী আমাদের থাকতে দেন বা বের করে দেন তার পরোয়া করা হবে না। দরবারে পৌছার সাথে সাথেই নাজ্জাশী প্রশ্ন করলেন, "তোমরা এটা কি করলে, নিজেদের জাতির ধর্মও ত্যাগ করলে আবার আমার ধর্মেও প্রবেশ করলে না, অন্যদিকে দুনিয়ার অন্য কোনো ধর্মও গ্রহণ করলে না ?" এর জবাবে মুহাজিরদের পক্ষ থেকে হযরত জাফর ইবনে আবু তালেব রাদিয়াল্লাহু আনহু তাৎক্ষণিক একটি ভাষণ দিলেন। এ ভাষণে তিনি প্রথমে আরবীয় জাহেলিয়াতের ধর্মীয়, নৈতিক ও সামাজিক দুষ্কৃতির বর্ণনা দেন। তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবের কথা উল্লেখ করে তিনি কি শিক্ষা দিয়ে চলেছেন তা ব্যক্ত করেন। তারপর কুরাইশরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য গ্রহণকারীদের ওপর যেসব জুলুম-নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছিল সেগুলো বর্ণনা করেন এবং সবশেষে একথা বলে নিজের বক্তব্যের উপসংহার টানেন যে, আপনার দেশে আমাদের ওপর কোনো জুলুম হবে না এ আশায় আমরা অন্য দেশের পরিবর্তে আপনার দেশে এসেছি।" নাজ্জাশী এ ভাষণ শুনে বললেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের নবীর ওপর যে কালাম নাযিল হয়েছে বলে তোমরা দাবী করছো তা একটু আমাকে শুনাও তো দেখি। জবাবে হযরত জাফর সূরা মারয়ামের গোড়ার দিকের হযরত ইয়াহ্‌ইয়া ও হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের সাথে সম্পর্কিত অংশটুকু শুনালেন। নাজ্জাশী তা শুনছিলেন এবং কেঁদে চলছিলেন। কাঁদতে কাঁদতে তাঁর দাড়ি ভিজে গেলো। যখন হযরত জাফর তেলাওয়াত শেষ করলেন তখন তিনি বললেন, "নিশ্চিতভাবেই এ কালাম এবং হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম যা কিছু এনেছিলেন উভয়ই একই উৎস থেকে উৎসারিত। আল্লাহর কসম! আমি তোমাদেরকে ওদের হাতে তুলে দেবো না।"

পরদিন আমর ইবনুল আস নাজ্জাশীকে বললো, "ওদেরকে ডেকে একটু জিজ্ঞেস করে দেখুন, ঈসা ইবনে মারয়াম সম্পর্কে ওরা কি আকীদা পোষণ করে ? তাঁর সম্পর্কে ওরা একটা মারাত্মক কথা বলে ? নাজ্জাশী আবার মুহাজিরদেরকে ডেকে পাঠালেন। আমরের চালবাজীর কথা মুহাজিররা আগেই জানতে পেরেছিলেন। তারা আবার একত্র হয়ে পরামর্শ করলেন যে, নাজ্জাশী যদি ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে প্রশ্ন করেন তাহলে তার কি জবাব দেয়া যাবে। পরিস্থিতি বড়ই নাজুক ছিল। এজন্য সবাই পেরেশান ছিলেন। কিন্তু তবুও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণ এ

ফায়সালাই করলেন যে, যা হয় হোক, আমরা তো সেই কথাই বলবো যা আল্লাহ ও তাঁর রসূল শিখিয়েছেন। কাজেই যখন তারা দরবারে গেলেন এবং নাজ্জাশী আমর ইবনুল আসের প্রশ্ন তাদের সামনে রাখলেন তখন জাফর ইবনে আবু তালেব উঠে দাঁড়িয়ে নির্দ্ধিধায় বললেন ঃ

هُوَ عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهُ وَرُوْحُهُ وَكَلِمَتُهُ اَلْقَاهَا اِلٰى مَرْيَمَ الْعَذْرَاءَ الْبَتُوْلِ

"তিনি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসূল এবং তাঁর পক্ষ থেকে একটি রূহ ও একটি বাণী, যা আল্লাহ কুমারী মার্‌য়ামের নিকট পাঠান।"

একথা শুনে নাজ্জাশী মাটি থেকে একটি তৃণখণ্ড তুলে নিয়ে বললেন, "আল্লাহর কসম! তোমরা যা কিছু বললে, হযরত ঈসা তার থেকে এ তৃণখণ্ডের চেয়েও বেশী কিছু ছিলেন না।" এরপর নাজ্জাশী কুরাইশদের পাঠানো সমস্ত উপঢৌকন এই বলে ফেরত দিয়ে দিলেন যে, "আমি ঘুষ নিই না এবং মুহাজিরদেরকে বলে দিলেন, তোমরা পরম নিশ্চিন্তে বসবাস করতে থাকো।"

আলোচ্য বিষয় ও কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু

এ ঐতিহাসিক পটভূমির প্রতি দৃষ্টি রেখে যখন আমরা এ সূরাটি দেখি তখন এর মধ্যে সর্বপ্রথম যে কথাটি সুস্পষ্ট হয়ে আমাদের সামনে আসে সেটি হচ্ছে এই যে, যদিও মুসলমানরা একটি মযলুম শরণার্থী দল হিসেবে নিজেদের স্বদেশ ভূমি ত্যাগ করে অন্য দেশে চলে যাচ্ছিল তবু এ অবস্থায়ও আল্লাহ তাদেরকে দীনের ব্যাপারে সামান্যতম আপোস করার শিক্ষা দেননি। বরং চলার সময় পাথেয় স্বরূপ এ সূরাটি তাদের সাথে দেন, যাতে ঈসায়ীদের দেশে তারা ঈসা আলাইহিস সালামের একেবারে সঠিক মর্যাদা তুলে ধরেন এবং তাঁর আল্লাহর পুত্র হওয়ার ব্যাপারটা পরিষ্কারভাবে অস্বীকার করেন।

প্রথম দু' রুকূ'তে হযরত ইয়াহ্‌ইয়া আলাইহিস সালাম ও হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের কাহিনী শুনাবার পর আবার তৃতীয় রুকূ'তে সমকালীন অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের কাহিনী শুনানো হয়েছে। কারণ এ একই ধরনের অবস্থায় তিনিও নিজের পিতা, পরিবার ও দেশবাসীর জুলুম নিপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে স্বদেশ ত্যাগ করেছিলেন। এ থেকে একদিকে মক্কার কাফেরদেরকে এ শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, আজ হিজরতকারী মুসলমানরা ইবরাহীমের পর্যায়ে রয়েছে এবং তোমরা রয়েছো সেই জালেমদের পর্যায়ে যারা তোমাদের পিতা ও নেতা ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে গৃহত্যাগী করেছিল। অন্যদিকে মুহাজিরদের এ সুখবর দেয়া হয়েছে যে, ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যেমন স্বদেশ ত্যাগ করে ধ্বংস হয়ে যাননি বরং আরো অধিকতর মর্যাদাশালী হয়েছিলেন তেমনি শুভ পরিণাম তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।

এরপর চতুর্থ রুকূ'তে অন্যান্য নবীদের কথা আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে একথা বলাই উদ্দেশ্য যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে দীনের বার্তা বহন করে এনেছেন সকল নবীই সেই একই দীনের বার্তাবহ ছিলেন। কিন্তু নবীদের তিরোধানের পর তাঁদের উম্মতগণ বিকৃতির শিকার হতে থেকেছে। আজ বিভিন্ন উম্মতের মধ্যে যেসব গোমরাহী দেখা যাচ্ছে এগুলো সে বিকৃতিরই ফসল।

শেষ দু' রুকূ'তে মক্কার কাফেরদের ভ্রষ্টতার কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে এবং কথা শেষ করতে গিয়ে মু'মিনদেরকে এ মর্মে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে যে, সত্যের শত্রুদের যাবতীয় প্রচেষ্টা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত তোমরা জনগণের প্রিয়ভাজন হবেই।

كٓهٰيٰعٓصٓ ۟ۚ ① ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهٗ زَكَرِيَّا ۖۚ ② اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ نِدَآءً خَفِيًّا ③ قَالَ رَبِّ اِنِّىْ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّىْ وَاشْتَعَلَ الرَّاْسُ شَيْبًا وَّلَمْ اَكُنْۢ بِدُعَآئِكَ رَبِّ شَقِيًّا ④ وَاِنِّىْ خِفْتُ الْمَوَالِىَ مِنْ وَّرَآءِىْ وَكَانَتِ امْرَاَتِىْ عَاقِرًا فَهَبْ لِىْ مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ۙ ⑤ يَّرِثُنِىْ وَيَرِثُ مِنْ اٰلِ يَعْقُوْبَ ۖۗ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ⑥ يٰزَكَرِيَّآ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمِ ۣ اسْمُهٗ يَحْيٰى ۙ لَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ⑦

কা-ফ্ হা-ইয়া–আই-ন্ সা-দ। এটি তোমার রবের অনুগ্রহের বিবরণ,[১] যা তিনি তাঁর বান্দা যাকারিয়ার[২] প্রতি করেছিলেন, যখন সে চুপে চুপে নিজের রবকে ডাকলো।

সে বললো, "হে আমার রব! আমার হাড়গুলো পর্যন্ত নরম হয়ে গেছে, মাথা বার্ধক্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে ; হে পরওয়ারদিগার ! আমি কখনো তোমার কাছে দোয়া চেয়ে ব্যর্থ হইনি। আমি আমার পর নিজের স্বজন-স্বগোত্রীয়দের অসদাচরণের আশংকা করি[৩] এবং আমার স্ত্রী বন্ধ্যা। (তথাপি) তুমি নিজের বিশেষ অনুগ্রহ বলে আমাকে একজন উত্তরাধিকারী দান করো, যে আমার উত্তরাধিকারী হবে এবং ইয়াকুব বংশেরও উত্তরাধিকারী হবে।[৪] আর হে পরোয়ারদিগার ! তাকে একজন পসন্দনীয় মানুষে পরিণত করো।"

(জবাব দেয়া হলো) "হে যাকারিয়া ! আমি তোমাকে একটি পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি, যার নাম হবে ইয়াহইয়া, এ নামে কোনো লোক আমি এর আগে সৃষ্টি করিনি।"[৫]

قَالَ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ غُلٰمٌ وَّكَانَتِ امْرَاَتِىْ عَاقِرًا وَّقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ۝٨ قَالَ كَذٰلِكَ ۚ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىَّ هَيِّنٌ وَّقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْـًٔا ۝٩ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّىْٓ اٰيَةً ۚ قَالَ اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ۝١٠ فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهٖ مِنَ الْمِحْرَابِ فَاَوْحٰٓى اِلَيْهِمْ اَنْ سَبِّحُوْا بُكْرَةً وَّعَشِيًّا ۝١١

সে বললো, "হে আমার রব ! আমার ছেলে হবে কেমন করে যখন আমার স্ত্রী বন্ধ্যা এবং আমি বুড়ো হয়ে শুকিয়ে গেছি ?"

জবাব এলো, "এমনটিই হবে, তোমার রব বলেন, এ তো আমার জন্য সামান্য ব্যাপার মাত্র, এর আগে আমি তোমাকে সৃষ্টি করেছি যখন তুমি কিছুই ছিলে না।"[৬]

যাকারিয়া বললেন, হে আমার রব ! আমার জন্য নিদর্শন স্থির করে দাও।

বললেন, "তোমার জন্য নিদর্শন হচ্ছে, তুমি পরপর তিনদিন লোকদের সাথে কথা বলতে পারবে না।"

কাজেই সে মিহ্‌রাব[৭] *থেকে বের হয়ে নিজের সম্প্রদায়ের সামনে এলো এবং ইশারায় তাদেরকে সকাল-সাঁঝে আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করার নির্দেশ দিল।*[৮]

১. তুলনামূলক অধ্যয়নের জন্য সূরা আলে ইমরানের ৪ রুকূ' সামনে রাখুন। সেখানে এ ঘটনাটি অন্যভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। (দেখুন তাফহীমুল কুরআন, ১ খণ্ড, ২৪৬-২৫০ পৃষ্ঠা)

২. এখানে যে হযরত যাকারিয়ার কথা আলোচনা করা হচ্ছে তিনি ছিলেন হযরত হারুনের বংশধর। তাঁর মর্যাদা সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে হলে বনী ইসরাঈলের যাজক ব্যবস্থা (Priesthood) সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করতে হবে। ফিলিস্তিন দখল করার পর বনী ইসরাঈল দেশের শাসন ব্যবস্থা এমনভাবে সংগঠিত করেছিল যার ফলে হযরত ইয়াকুব (আ)-এর সন্তানদের ১২টি গোত্রের মধ্যে সমগ্র দেশ বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল এবং ১৩তম গোত্রটি (অর্থাৎ লাভী ইবনে ইয়াকুবের গোত্র) ধর্মীয় কার্যকলাপ পরিচালনার জন্য নির্দিষ্ট হয়েছিল। আবার বনী লাভীর মধ্যেও যে পরিবারটি বাইতুল মাকদিসে খোদাবন্দের সামনে ধূপ জ্বালাবার দায়িত্ব পালন এবং পবিত্রতম জিনিসসমূহের পবিত্রতা বর্ণনা করার কাজ করতো তারা ছিল হযরত হারুনের বংশধর। বনী লাভীর অন্যান্য

লোকেরা বাইতুল মাকদিসের মধ্যে যেতে পারতো না বরং আল্লাহর গৃহের পরিচর্যার সময় আঙ্গিনায় ও বিভিন্ন কক্ষে কাজ করতো। শনিবার ও ঈদের সময় কুরবানী করতো এবং বাইতুল মাকদিসের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে বনী হারুনকে সাহায্য করতো।

বনী হারুনের চব্বিশটি শাখা ছিল। তারা পালাক্রমে বাইতুল মাকদিসের সেবায় হাযির হতো। এই শাখাগুলোর মধ্যে একটি ছিল আবৃইয়াহর শাখা। এর সরদার ছিলেন হযরত যাকারিয়া। নিজের গোত্রের পালার দিন তিনিই মাকদিসে যেতেন এবং আল্লাহর সমীপে ধূপ জ্বালাবার দায়িত্ব পালন করতেন। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন বাইবেলের বংশাবলী-১ পুস্তক ২৩ ও ২৪ অধ্যায়)

৩. এর অর্থ হচ্ছে, আবৃইয়াহর পরিবারে আমার পরে এমন কাউকে দেখা যায় না, যে ব্যক্তি দীনি ও নৈতিক দিক দিয়ে আমি যে পদে অধিষ্ঠিত আছি তার যোগ্য হতে পারে। তারপর সামনের দিকে যে প্রজন্ম এগিয়ে আসছে তাদের চালচলন বিকৃত দেখা যাচ্ছে।

৪. অর্থাৎ আমি কেবলমাত্র নিজের উত্তরাধিকারী চাই না বরং ইয়াকুব বংশের যাবতীয় কল্যাণের উত্তরাধিকারী চাই।

৫. এ ক্ষেত্রে লূকের সুসমাচারে যে শব্দাবলী ব্যবহার করা হয়েছে তা হচ্ছে ঃ "আপনার গোষ্ঠীতে তো এ নামের কোনো লোক নেই।" (১ ঃ ৬১)

৬. হযরত যাকারিয়ার এই প্রশ্ন এবং ফেরেশতাদের জবাব সামনে রাখুন। কারণ সামনের দিকে হযরত মারয়ামের কাহিনীতে এ বিষয়বস্তু আবার আসছে এবং এখানে এর যে অর্থ সেখানেও সেই একই অর্থ হওয়া উচিত। হযরত যাকারিয়া বলেন, আমি একজন বৃদ্ধ এবং আমার স্ত্রী বন্ধ্যা, আমার ছেলে হতে পারে কেমন করে ! ফেরেশতারা জবাব দেন, "এমনিই হবে।" অর্থাৎ তোমার বার্ধক্য ও তোমার স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব সত্ত্বেও তোমার ছেলে হবে। তারপর ফেরেশেতা আল্লাহর কুদরাতের বরাত দিয়ে বলেন, যে আল্লাহ তোমাকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব দান করেছেন, তোমার মত খুনখুনে বুড়োর ঔরসে আজীবন বন্ধ্যা এক বৃদ্ধার গর্ভে সন্তান জন্ম দেয়া তাঁর কুদরাতের অসাধ্য নয়।

৭. মিহরাবের ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আলে ইমরান, ৩৬ টীকা।

৮. লূক লিখিত সুসমাচারে এই ঘটনার যে বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে তা আমরা এখানে উদ্ধৃত করছি। এভাবে পাঠকের সামনে কুরআনের পাশাপাশি খৃষ্টীয় বর্ণনাও রাখা যাবে এবং মাঝে মাঝে বন্ধনীর মধ্যে থাকছে আমাদের বক্তব্য ঃ

"যিহূদিয়ার রাজা হেরোদের সময়ে (দেখুন তাফহীমুল কুরআন, বনী ইসরাঈল, ৯ টীকা) অবিয়ের পালার মধ্যে সখরীয় (যাকারিয়া) নামক একজন যাজক ছিলেন, তাঁহার স্ত্রী হারোণ বংশীয়া, তাঁহার নাম ইলীশাবেৎ (Elizabeth) তাঁহারা দুইজন ঈশ্বরের সাক্ষাতে ধার্মিক ছিলেন, প্রভুর সমস্ত আজ্ঞা ও বিধি অনুসারে নির্দোষরূপে চলিতেন। তাঁহাদের সন্তান ছিল না, কেননা, ইলীশাবেৎ বন্ধ্যা ছিলেন এবং দুই জনেরই অধিক বয়স হইয়াছিল। একদা যখন সখরীয় (যাকারিয়া) নিজ পালার অনুক্রমে

يَٰيَحْيَىٰ خُذِ ٱلْكِتَٰبَ بِقُوَّةٍ ۖ وَءَاتَيْنَٰهُ ٱلْحُكْمَ صَبِيًّا ۝١٢ وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَوٰةً ۖ وَكَانَ تَقِيًّا ۝١٣ وَبَرًّۢا بِوَٰلِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا ۝١٤ وَسَلَٰمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ۝١٥

"হে ইয়াহ্‌ইয়া ! আল্লাহর কিতাবকে মযবুতভাবে আঁকড়ে ধরো।"[৯]

আমি তাকে শৈশবেই "হুকুম"[১০] *দান করেছি এবং নিজের পক্ষ থেকে হৃদয়ের কোমলতা*[১১] *ও পবিত্রতা দান করেছি, আর সে ছিল খুবই আল্লাহভীরু এবং নিজের পিতামাতার অধিকার সচেতন, সে উদ্ধত ও নাফরমান ছিলো না। শান্তি তার প্রতি যেদিন সে জন্ম লাভ করে এবং যেদিন সে মৃত্যুবরণ করে আর যেদিন তাকে জীবিত করে উঠানো হবে।*[১২]

ঈশ্বরের সাক্ষাতে যাজকীয় কার্য করিতেছিলেন, তখন যাজকীয় কার্যের প্রথানুসারে গুলিবাঁট ক্রমে তাঁহাকে প্রভুর মন্দিরে প্রবেশ করিয়া ধূপ জ্বালাইতে হইল। সেই ধূপদাহের সময়ে সমস্ত লোক বাহিরে থাকিয়া প্রার্থনা করিতেছিল। তখন প্রভুর এক দূত ধূপবেদির দক্ষিণ পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে দর্শন দিলেন। দেখিয়া সখরিয় (যাকারিয়া) ত্রাসযুক্ত হইলেন, ভয় তাঁহাকে আক্রমণ করিল। কিন্তু দূত তাঁহাকে বলিলেন, সখরিয় ভয় করিও না। কেননা তোমার বিনতি গ্রাহ্য হইয়াছে, [বাইবেলের কোথাও হযরত সখরিয়ার (যাকারিয়ার) দোয়ার উল্লেখ নেই] তোমার স্ত্রী ইলীশাবেৎ তোমার জন্য পুত্র প্রসব করিবেন, ও তুমি তাহার নাম যোহন (অর্থাৎ ইয়াহ্ইয়া) রাখিবে। আর তোমার আনন্দ ও উল্লাস হইবে এবং তাহার জন্মে অনেকে আনন্দিত হইবে। কারণ সে প্রভুর সম্মুখে মহান হইবে, (এ বিষয়টি ব্যক্ত করার জন্য সূরা আলে ইমরানে سَيِّدًا শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে) এবং দ্রাক্ষারস কি সুরা কিছুই পান করিবে না, (تَقِيًّا) আর সে মাতার গর্ভ হইতেই পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হইবে ; (وَاٰتَيْنٰهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا) এবং ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্যে অনেককে তাহাদের ঈশ্বর প্রভুর প্রতি ফিরাইবে। সে তাহার সম্মুখে এলিয়ের (ইলিয়াস আলাইহিস সালাম) আত্মায় ও পরাক্রমে গমন করিবে, যেন পিতৃগণের হৃদয় সন্তানদের প্রতি ও অনাজ্ঞাবহদিগকে ধার্মিকদের বিজ্ঞতায় চলিবার জন্য ফিরাইতে পারে, প্রভুর নিমিত্ত সুসজ্জিত এক প্রজামণ্ডলী প্রস্তুত করিতে পারে।

তখন সখরিয় (যাকারিয়া) দূতকে কহিলেন, কিসে ইহা জানিব ? কেননা আমি বৃদ্ধ এবং আমার স্ত্রীরও অধিক বয়স হইয়াছে। দূত উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, আমি গাব্রিয়েল (জিব্রীল) ঈশ্বরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকি, তোমার সহিত কথা কহিবার ও তোমাকে এ সকল বিষয়ের সুসমাচার দিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছি। আর দেখ, এই সকল যেদিন ঘটিবে, সেই দিন পর্যন্ত তুমি নীরব থাকিবে, কথা কহিতে পারিবে না ; যেহেতুক আমার এই যে সকল বাক্য যথাসময়ে সফল হইবে, ইহাতে তুমি বিশ্বাস

করিলে না। (এ বর্ণনাটি কুরআন থেকে ভিন্নতর। কুরআন একে নিদর্শন গণ্য করে এবং লূকের বর্ণনা একে বলে শাস্তি। তাছাড়া কুরআন কেবলমাত্র তিন দিন কথা না বলার কথা বলে এবং লূক বলেন, সেই সময় থেকে হযরত ইয়াহ্‌ইয়ার জন্ম হওয়া পর্যন্ত হযরত যাকারিয়া নীরব থাকেন)। আর লোক সকল সখরিয়ের অপেক্ষা করিতেছিল ; এবং মন্দিরের মধ্যে তাঁহার বিলম্ব হওয়াতে তাহারা আশ্চর্য জ্ঞান করিতে লাগিল। পরে তিনি বাহিরে আসিয়া তাহাদের কাছে কথা কহিতে পারিলেন না; তখন তাহারা বুঝিল যে, মন্দিরের মধ্যে তিনি কোনো দর্শন পাইয়াছেন আর তিনি তাহাদের নিকটে নানা সংকেত করিতে থাকিলেন এবং বোবা হইয়া রহিলেন।" (লূক ১ঃ ৫-২২)

৯. মাঝখানে এই বিস্তারিত তথ্য পরিবেশিত হয়নি যে, আল্লাহর ফরমান অনুযায়ী হযরত ইয়াহ্‌ইয়া (আ)-এর জন্ম হয় এবং শৈশব থেকে তিনি যৌবনে পদার্পণ করেন। এখন বলা হচ্ছে, যখন তিনি জ্ঞানলাভের নির্দিষ্ট বয়ঃসীমায় পৌঁছেন তখন তাঁর ওপর কি দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। এখানে মাত্র একটি বাক্যে নবুওয়াতের মহান মর্যাদায় অভিষিক্ত করার সময় তার ওপর যে দায়িত্ব অর্পিত হয় তার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ তিনি তাওরাতকে সুদৃঢ় ভাবে আঁকড়ে ধরবেন এবং বনী ইসরাঈলকে এ পথে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করবেন।

১০. "হুকুম" অর্থাৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণের শক্তি, ইজতিহাদ করার শক্তি, দীনের গভীর তত্ত্বজ্ঞান, জীবন সমস্যার ক্ষেত্রে সঠিক মত প্রকাশের যোগ্যতা এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে বিভিন্ন বিষয়ে ফায়সালা দান করার ক্ষমতা।

১১. আসলে حَنَانً শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এটি মমতার প্রায় সমার্থক শব্দ। অর্থাৎ একজন মায়ের মনে নিজের সন্তানের জন্য যে চূড়ান্ত পর্যায়ের স্নেহশীলতা থাকে, যার ভিত্তিতে সে শিশুর কষ্টে অস্থির হয়ে পড়ে, আল্লাহর বান্দাদের জন্য হযরত ইয়াহ্‌ইয়ার মনে এই ধরনের স্নেহ-মমতা সৃষ্টি হয়েছিল।

১২. বাইবেলের বিভিন্ন পুস্তকে হযরত ইয়াহ্‌ইয়ার জীবনের যে ঘটনাবলী ছড়িয়ে আছে সেগুলো একত্র করে আমি এখানে তাঁর পূতপবিত্র জীবনের একটি চিত্র তুলে ধরছি। এর সাহায্যে সূরা আলে ইমরান এবং এ সূরাটির সংক্ষিপ্ত ইশারা ইংগিতগুলোর ব্যাখ্যা হয়ে যাবে।

লূকের বর্ণনা অনুসারে হযরত ইয়াহ্‌ইয়া (আ) ছিলেন, হযরত ইসা (আ)-এর চেয়ে ৬ মাসের বড়। তাঁর মাতা হযরত ঈসা (আ)-এর মাতার নিকটাত্মীয়া ছিলেন। প্রায় ৩০ বছর বয়সে তিনি কার্যকরভাবে নবুওয়াতের দায়িত্ব লাভ করেন। যোহনের বর্ণনা অনুযায়ী তিনি ট্রান্স জর্ডন এলাকায় আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়ার কাজ শুরু করেন। তিনি বলতেন ঃ

"আমি প্রান্তরে এক জনের রব যে ঘোষণা করিতেছে তোমর প্রভূর সরল পথ ধর।" (যোহন ১ ঃ ২৩)

মার্কের বর্ণনা মতে তিনি লোকদের পাপের জন্য তাদের তাওবা করাতেন এবং তাওবাকারীদেরকে বাপ্তাইজ করতেন। অর্থাৎ তাওবা করার পর তাদেরকে গোসল করাতেন, যাতে আত্মা ও শরীর উভয়ই পবিত্র হয়ে যায়। ইয়াহুদিয়া (যিহূদা) ও জেরুসালেমের অধিকাংশ লোক তাঁর ভক্ত হয়ে গিয়েছিল এবং তাঁর দ্বারা বাপ্তাইজিত হচ্ছিল। (মার্ক ১ ঃ ৪-৫) এজন্য তিনি বাপ্তাইজক ইয়াহ্‌ইয়া (Jhon the Baptist) নামে

পরিচিত হয়ে গিয়েছিলেন। সাধারণভাবে বনী ইসরাঈল তাঁর নবুওয়াত স্বীকার করে নিয়েছিল। (মথি ২১ ঃ ২৬) ঈসা আলাইহিস সালামের উক্তি ছিল, "স্ত্রী লোকের গর্ভজাত সকলের মধ্যে যোহন বাপ্তাইজক হইতে মহান কেহই উৎপন্ন হয় নাই।" (মথি ১১ঃ১১)

তিনি উটের লোমের কাপড় পরতেন, চর্মপটুকা কোমরে বাঁধতেন এবং তাঁর খাদ্য ছিল পঙ্গপাল ও বনমধু। (মথি ৩ ঃ ৪) এই ফকিরী জীবন যাপনের সাথে সাথে তিনি প্রচার করে বেড়াতেন ঃ "মন ফিরাও (অর্থাৎ তাওবা কর) কেননা, স্বর্গ রাজ্য সন্নিকট হইল।" (মথি ৩ ঃ ২) অর্থাৎ ঈসা আলাইহিস সালামের নবুওয়াতের দাওয়াতের সূচনা হতে যাচ্ছে। এ কারণে তাঁকে সাধারণত হযরত ঈসার (আ) 'আরহাস' বলা হতো। কুরআন মজীদেও তাঁর সম্পর্কে এ কথাই এভাবে বলা হয়েছে ঃ

مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ

"সে আল্লাহর বাণীর সত্যতার সাক্ষ্যদানকারী" (আলে ইমরান ৩৯)

তিনি. লোকদের নামায পড়ার ও রোযা রাখার উপদেশ দিতেন (মথি ৯ ঃ ১৪, লূক ৫ ঃ ৩৩, লূক ১১ঃ ১)

তিনি লোকদের বলতেন, "যাহার দুইটি আঙরাখা আছে, সে, যাহার নাই, তাহাকে একটি দিউক ; আর যাহার কাছে খাদ্যদ্রব্য আছে সেও তদ্রূপ করুক।" কর গ্রাহীরাও তাকে জিজ্ঞেস করলো, গুরু আমরা কি করবো ? তাতে তিনি জবাব দেন, "তোমাদের জন্য যাহা নিরূপিত তাহার অধিক আদায় করিও না।" সৈনিকরা জিজ্ঞেস করলো, আমাদের প্রতি কি নির্দেশ ? জবাব দেন, "কাহারও প্রতি দৌরাত্ম্য করিও না, অন্যায় পূর্বক কিছু আদায়ও করিও না এবং তোমাদের বেতনে সন্তুষ্ট থাকিও।" (লূক ৩ ঃ ১০-১৪) বনী ইসরাঈলদের বিপথগামী উলামা, ফরীশী ও সদ্দূকীরা তাঁর কাছে বাপ্তাইজ হবার জন্য এলে তিনি তাদেরকে ধমক দিয়ে বলেন, "হে সর্পের বংশেরা আগামী কোপ হইতে পলায়ন করিতে তোমাদিগকে কে চেতনা দিল ?...... আর ভাবিওনা যে, তোমরা মনে মনে বলিতে পার আব্রাহাম আমাদের পিতা, ... আর এখন গাছগুলোর মূলে কুড়াল লাগান আছে, অতএব যে কোনো গাছে উত্তম ফল ধরে না, তাহা কাটিয়া আগুনে ফেলিয়া দেওয়া যায়।" (মথি ৩ ঃ ৭-১০)

তাঁর যুগের ইহুদী শাসনকর্তা হীরোদ এন্টিপাসের রাজ্যে তিনি সত্যের দাওয়াতের দায়িত্ব পালন করছিলেন। এই শাসনকর্তা ছিল আপাদমস্তক রোমীয় সভ্যতার প্রতিভূ। তারই কারণে সারা দেশে দুষ্কৃতি, নৈতিকতা বিরোধী ও আল্লাহর প্রতি অবাধ্যতামূলক কার্যকলাপ প্রসার লাভ করছিল। সে নিজের ভাই ফিলিপের স্ত্রী হিরোদিয়াসকে নিজের গৃহে রক্ষিতা রেখেছিল। হযরত ইয়াহ্ইয়া এ জন্য হিরোদকে ভর্ৎসনা করেন এবং তার পাপাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। এ অপরাধে হিরোদ তাঁকে গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠায়। তবুও সে তাঁকে একজন পবিত্রাত্মা ও সৎকর্মশীল মনে করে তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতো এবং জনগণের মধ্যে তাঁর প্রভাবের কারণে তাঁকে ভয়ও করতো। কিন্তু হিরোদিয়াস মনে করতো, ইয়াহ্ইয়া আলাইহিস সালাম জনগণের মধ্যে যে নৈতিক চেতনা সঞ্চার করছেন তার ফলে জনগণের দৃষ্টিতে তার মতো মেয়েরা ঘৃণিত হয়ে যাচ্ছে। তাই তাঁর

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ﴿١٦﴾
فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ
لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ﴿١٧﴾ قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَٰنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا ﴿١٨﴾
قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ﴿١٩﴾ قَالَتْ أَنَّىٰ
يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ﴿٢٠﴾ قَالَ كَذَٰلِكِ قَالَ
رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَكَانَ أَمْرًا
مَّقْضِيًّا ﴿٢١﴾ فَحَمَلَتْهُ فَانتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ﴿٢٢﴾

২ রুকূ'

আর (হে মুহাম্মাদ!) এ কিতাবে মারয়ামের অবস্থা বর্ণনা করো।[১৩] যখন সে নিজের লোকদের থেকে আলাদা হয়ে পূর্ব দিকে নির্জনবাসী হয়ে গিয়েছিল এবং পর্দা টেনে তাদের থেকে নিজেকে আড়াল করে নিয়েছিল।[১৪] এ অবস্থায় আমি তার কাছে নিজের রূহকে অর্থাৎ (ফেরেশতাকে) পাঠালাম এবং সে তার সামনে একটি পূর্ণ মানবিক কায়া নিয়ে হাযির হলো।

মারয়াম অকস্মাত বলে উঠলো, "তুমি যদি আল্লাহকে ভয় করে থাকো তাহলে আমি তোমার হাত থেকে করুণাময়ের আশ্রয় চাচ্ছি।"

সে বললো, "আমি তো তোমার রবের দূত এবং আমাকে পাঠানো হয়েছে এ জন্য যে, আমি তোমাকে একটি পবিত্র পুত্র দান করবো।"

মারয়াম বললো, "আমার পুত্র হবে কেমন করে যখন কোনো পুরুষ আমাকে স্পর্শও করেনি এবং আমি ব্যভিচারিণীও নই ?"

ফেরেশতা বললো, "এমনটিই হবে, তোমার রব বলেন, এমনটি করা আমার জন্য অতি সহজ। আর আমি এটা এজন্য করবো যে, এই ছেলেকে আমি লোকদের জন্য একটি নিদর্শন[১৫] ও নিজের পক্ষ থেকে একটি অনুগ্রহে পরিণত করবো এবং এ কাজটি হবেই।"

মারয়াম এ সন্তানকে গর্ভে ধারণ করলো এবং এ গর্ভসহ একটি দূরবর্তী স্থানে চলে গেলো।[১৬]

প্রাণ সংহারের প্রচেষ্টা চালাতে থাকে। শেষ পর্যন্ত হিরোদের জন্ম বার্ষিকী উৎসবে সে তার কাংখিত সুযোগ পেয়ে যায়। উৎসবে তার মেয়ে মনোমুগ্ধকর নৃত্য প্রদর্শন করে হিরোদের চিত্ত জয় করে। হিরোদ সন্তুষ্ট হয়ে তাকে বলে, কি পুরস্কার চাও বলো। মেয়ে তার ব্যভিচারী মাকে জিজ্ঞেস করে, কি চাইবো ? মা বলে, ইয়াহ্ইয়ার মস্তক চাও। তাই সে হিরোদের সামনে হাতজোড় করে বলে, জাহাঁপনা! আমাকে এখনি ইয়াহ্ইয়া বাপ্তাইজকের মাথা একটি থালায় করে আনিয়ে দিন। হিরোদ একথা শুনে বড়ই বিষণ্ন হয়ে পড়ে। কিন্তু প্রিয়ার মেয়ের দাবী না মেনে উপায় ছিল না। সে তৎক্ষণাত কারাগার থেকে ইয়াহ্ইয়া আলাইহিস সালামের মাথা কেটে আনালো এবং তা একটি থালায় রেখে নর্তকীকে নজরানা দিল।(মথি ১৪ ঃ ৩-১২, মার্ক ৬ ঃ ১৭-১৯ ও লূক ৩ ঃ ১৯-২০)

১৩. তুলনামূলক অধ্যয়নের জন্য তাফহীমুল কুরআন সূরা আলে ইমরান ৪২ ও ৫৫ টীকা এবং সূরা নিসা ১৯০-১৯১ টীকা দেখুন।

১৪. সূরা আলে ইমরানে এ কথা বলা হয়েছে যে, হযরত মার্‌য়ামের মা তাঁর মানত অনুযায়ী তাঁকে বাইতুল মাকদিসে ইবাদাতের জন্য বসিয়ে দিয়েছিলেন। হযরত যাকারিয়া তাঁর হেফাজত ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। সেখানে একথাও বলা হয়েছে যে, হযরত মার্‌য়াম বাইতুল মাকদিসের একটি মিহরাবে ই'তিকাফ করছিলেন। এখন এখানে বলা হচ্ছে, যে মিহরাবটিতে হযরত মার্‌য়াম ই'তিকাফরত ছিলেন সেটি বাইতুল মাকদিসের পূর্বাংশে অবস্থিত ছিল। সেখানে তিনি ই'তিকাফকারীদের সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী একটি চাদর টাঙ্গিয়ে দিয়ে নিজেকে অন্যদের দৃষ্টি থেকে আড়াল করে নিয়েছিলেন। যারা বাইবেলের সাথে সামঞ্জস্য রাখার জন্য পূর্বাংশ অর্থে "নাসেরাহ" নিয়েছেন তারা ভুল করেছেন কারণ নাসেরাহ জেরুসালেমের উত্তর দিকে অবস্থিত, পূর্বদিকে নয়।

১৫. ইতোপূর্বে ৬ টীকায় আমরা ইংগিত করেছি, হযরত মার্‌য়ামের বিস্ময়ের জবাবে ফেরেশতার "এমনটিই হবে" একথা বলার কোনোক্রমেই এ অর্থ হতে পারে না যে, মানুষ তোমাকে স্পর্শ করবে এবং তোমার ছেলে হবে। বরং এর পরিষ্কার অর্থ হচ্ছে এই যে, কোনো মানুষ তোমাকে স্পর্শ না করা সত্ত্বেও তোমার ছেলে হবে। উপরে এ একই শব্দাবলীর মাধ্যমে হযরত যাকারিয়ার বিস্ময়ও উদ্ধৃত হয়েছে এবং সেখানেও ফেরেশতা সেই একই জবাব দিয়েছে। একথা পরিষ্কার, সেখানে এ জবাবটির যে অর্থ এখানেও তাই। অনুরূপভাবে সূরা যারিয়ার ২৮-৩০ আয়াতে যখন ফেরেশতা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে পুত্রের সুসংবাদ দেন এবং হযরত সারাহ বলেন, আমার মতো বুড়ী বন্ধ্যা মেয়েলোকের আবার ছেলে হবে কেমন করে ? তখন ফেরেশতা তাঁকে জবাব দেন, كذلك "এমনটি হবে।" একথা সুস্পষ্ট যে, এর অর্থ হচ্ছে, বার্ধক্য ও বন্ধ্যাত্ব সত্ত্বেও তাদের ছেলে হবেই। তাছাড়া যদি كذلك অর্থ এই নেয়া হয় যে, মানুষ তোমাকে স্পর্শ করবে এবং তোমার ছেলে হবে ঠিক তেমনি ভাবে যেমন সারা দুনিয়ার মেয়েদের ছেলে হয়, তাহলে তো পরবর্তী বাক্য দুটি একেবারেই অর্থহীন হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় একথা বলার কি প্রয়োজন থাকে যে, তোমার রব বলছেন, এমনটি করা আমার জন্য অতি সহজ এবং আমি ছেলেটিকে একটি নিদর্শন করতে চাই ? নিদর্শন শব্দটি এখানে সুস্পষ্টভাবে মুজিযা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং এ বাক্যটি একথাই প্রকাশ করে যে, "এমনটি করা আমার জন্য বড়ই সহজ।" কাজেই এ উক্তির অর্থ এছাড়া আর কিছুই নয় যে, আমি এ

فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ ۚ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَّنسِيًّا ﴿٢٣﴾ فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ﴿٢٤﴾ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ﴿٢٥﴾ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا ۖ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا ﴿٢٦﴾ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ ۖ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا ﴿٢٧﴾ يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا ﴿٢٨﴾

তারপর প্রসব বেদনা তাকে একটি খেজুর গাছের তলে পৌঁছে দিল। সে বলতে থাকলো, "হায়! যদি আমি এর আগেই মরে যেতাম এবং আমার নাম-নিশানাই না থাকতো।"[১৭] ফেরেশতা পায়ের দিক থেকে তাকে ডেকে বললো, "দুঃখ করো না, তোমার রব তোমার নীচে একটি নহর প্রবাহিত করেছেন এবং তুমি এ গাছের কাণ্ডটি একটু নাড়া দাও, তোমার ওপর তরতাজা খেজুর ঝরে পড়বে। তারপর তুমি খাও, পান করো এবং নিজের চোখ জুড়াও। তারপর যদি তুমি মানুষের দেখা পাও তাহলে তাকে বলে দাও, আমি করুণাময়ের জন্য রোযার মানত মেনেছি, তাই আজ আমি কারোর সাথে কথা বলবো না।[১৮]

তারপর সে এ শিশুটিকে নিয়ে নিজের সম্প্রদায়ের মধ্যে এলো। লোকেরা বলতে লাগলো, "হে মার্‌য়াম! তুমি তো মহা পাপ করে ফেলেছো। হে হারুনের বোন![১৯] না তোমার বাপ কোনো খারাপ লোক ছিল, না তোমার মা ছিল কোনো ব্যভিচারিণী।"

ছেলেটির সত্তাকে বনী ইসরাঈলের সামনে একটি মুজিযা হিসেবে পেশ করতে চাই। হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের সত্তাকে কিভাবে বনী ইরাঈলের সামনে মু'জিযা হিসেবে পেশ করা হয় পরবর্তী বিবরণ নিজেই তা সুস্পষ্ট করে দিয়েছে।

১৬. দূরবর্তী স্থান মানে বাইতুল লাহম। ই'তিকাফ থেকে উঠে সেখানে যাওয়া হযরত মার্‌য়ামের জন্য একটি স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। বনী ইসরাঈলের পবিত্রতম ঘরানা হারুন গোত্রের মেয়ে, তিনি আবার বাইতুল মাকদিসে আল্লাহর ইবাদাত করার জন্য উৎসর্গীত

হয়েছিলেন, তিনি হঠাৎ গর্ভধারণ করলেন। এ অবস্থায় যদি তিনি নিজের ই'তিকাফের জায়গায় বসে থাকতেন এবং লোকেরা তাঁর গর্ভধারণের কথা জানতে পারতো, তাহলে শুধুমাত্র পরিবারের লোকেরাই নয়, সম্প্রদায়ের অন্যান্য লোকেরাও তাঁর জীবন ধারণ কঠিন করে দিতো। তাই তিনি কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়ার পর নীরবে নিজের ই'তিকাফ কক্ষ ত্যাগ করে বাইরে বের হয়ে পড়লেন, যাতে আল্লাহর ইচ্ছা পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত নিজ সম্প্রদায়ের তিরস্কার, নিন্দাবাদ ও ব্যাপক দুর্ণাম থেকে রক্ষা পান। হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের জন্ম যে পিতা ছাড়াই হয়েছিল এ ঘটনাটি নিজেই তার একটি বিরাট প্রমাণ। যদি তিনি বিবাহিত হতেন এবং স্বামীর ঔরসে তাঁর সন্তান জন্মলাভের ব্যাপার হতো তাহলে তো সন্তান প্রসবের জন্য তার শ্বশুরালয়ে বা পিতৃগৃহে না গিয়ে একাকী একটি দূরবর্তী স্থানে চলে যাওয়ার কোনো কারণই ছিল না।

১৭. এ শব্দগুলো থেকে হযরত মার্‌য়ামের সে সময়কার পেরেশানীও অনুমান করা যেতে পারে। পরিস্থিতির নাজুকতা সামনে রেখে প্রত্যেক ব্যক্তিই উপলব্ধি করতে পারেন যে, প্রসব বেদনার কষ্টজনিত কারণে তাঁর মুখ থেকে একথাগুলো বের হয়নি বরং আল্লাহ তাঁকে যে ভয়াবহ পরীক্ষার সম্মুখীন করেছেন তাতে কিভাবে সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হবেন এই চিন্তায় তিনি পেরেশান হয়ে পড়েছিলেন। গর্ভাবস্থাকে এ পর্যন্ত যে কোনো ভাবে গোপন করতে সক্ষম হয়েছেন কিন্তু এখন শিশুটিকে কোথায় নিয়ে যাবেন ? এ পরবর্তী বাক্যাংশ অর্থাৎ ফেরেশতা বললেন, "দুঃখ করো না" মার্‌য়ামের বক্তব্য সুস্পষ্ট করে তুলেছেন যে, তিনি কেন একথা বলেছিলেন। বিবাহিত মেয়ের প্রথম সন্তান জন্মের সময় সে যতই কষ্ট পাক না কেন তার মনে কখনো দুখ ও বেদনাবোধ জাগে না।

১৮. অর্থাৎ শিশুর ব্যাপারে তোমার কিছু বলার প্রয়োজন নেই। তার জন্মের ব্যাপারে যে কেউ আপত্তি তুলবে তার জবাব দেবার দায়িত্ব এখন আমার। (উল্লেখ্য, বনী ইসরাঈলদের মধ্যে মৌনতা অবলম্বনের রোযা রাখার রীতি ছিল) হযরত মার্‌য়ামের আসল পেরেশানী কি ছিল এ শব্দাবলীও তা পরিষ্কার জানিয়ে দিচ্ছে। তাছাড়া এখানে এ বিষয়টিও প্রণিধানযোগ্য যে, বিবাহিতা মেয়ের প্রথম সন্তান যদি দুনিয়ার প্রচলিত নিয়মেই জন্মলাভ করে তাহলে তার মৌন ব্রত অবলম্বনের প্রয়োজন দেখা দেবে কেন ?

১৯. এ শব্দগুলোর দুটি অর্থ হতে পারে। একটি হচ্ছে, এখানে এগুলোর বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করা যায় এবং এ কথা মনে করা যায় যে, হযরত মার্‌য়ামের হারুন নামে কোনো ভাই ছিল। দ্বিতীয় অর্থটি হচ্ছে, আরবী বাগধারা অনুযায়ী أُخْتَ هَارُوْنَ মানে হচ্ছে "হারুন পরিবারের মেয়ে।" কারণ আরবীতে এটি একটি প্রচলিত বর্ণনা পদ্ধতি। যেমন মুদার গোত্রের লোককে يَا اَخَا مُضَرَ (হে মুদারের ভাই) এবং হামদান গোত্রের লোককে يَا اَخَا هَمَدَانَ (হে হামাদানের ভাই) বলে ডাকা হয়, প্রথম অর্থটিকে প্রাধান্য দেয়ার পক্ষে যুক্তি হচ্ছে এই যে, কোনো কোনো হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকেই এ অর্থটি উদ্ধৃত হয়েছে। আর দ্বিতীয় অর্থটির সমর্থনে যুক্তি হচ্ছে এই যে, পরিবেশ ও পরিস্থিতি এই অর্থটিই দাবী করে। কারণ এ ঘটনার কারণে জাতির মধ্যে যে অস্থিরতার সৃষ্টি হয়েছিল তার ফলে বাহ্যত জানা যায় না যে, হারুন নামের এক অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির কুমারী বোন শিশু সন্তান কোলে নিয়ে চলে এসেছিল। বরং যে জিনিসটি বিপুল সংখ্যক লোকদেরকে হযরত মারয়ামের চারদিকে সমবেত করে দিয়েছিল সেটি এ হতে পারতো যে,

فَاَشَارَتْ اِلَيْهِ ؕ قَالُوْا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِى الْمَهْدِ صَبِيًّا ۞ قَالَ اِنِّىْ عَبْدُ اللّٰهِ ؕ اٰتٰنِىَ الْكِتٰبَ وَجَعَلَنِىْ نَبِيًّا ۞ وَّجَعَلَنِىْ مُبٰرَكًا اَيْنَ مَا كُنْتُ ۪ وَاَوْصٰنِىْ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ۞ وَّبَرًّا بِوَالِدَتِىْ ؗ وَلَمْ يَجْعَلْنِىْ جَبَّارًا شَقِيًّا ۞ وَالسَّلٰمُ عَلَىَّ يَوْمَ وُلِدْتُّ وَيَوْمَ اَمُوْتُ وَيَوْمَ اُبْعَثُ حَيًّا ۞ ذٰلِكَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ ۚ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِىْ فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ ۞ مَا كَانَ لِلّٰهِ اَنْ يَّتَّخِذَ مِنْ وَّلَدٍ ۙ سُبْحٰنَهٗ ؕ اِذَا قَضٰٓى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ۞

মারয়াম শিশুর প্রতি ইশারা করলো।

লোকেরা বললো, "কোলের শিশুর সাথে আমরা কি কথা বলবো ?[২০]

শিশু বলে উঠলো, "আমি আল্লাহর বান্দা, তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন ও নবী করেছেন এবং বরকতময় করেছেন যেখানেই আমি থাকি না কেন আর যতদিন আমি বেঁচে থাকবো ততদিন নামায ও যাকাত আদায়ের হুকুম দিয়েছেন। আর নিজের মায়ের হক আদায়কারী করেছেন এবং আমাকে অহংকারী ও হতভাগা করেননি। শান্তি আমার প্রতি যখন আমি জন্ম নিয়েছি ও যখন আমি মরবো এবং যখন আমাকে জীবিত করে উঠানো হবে।[২১]

এ হচ্ছে মারয়ামের পুত্র ঈসা এবং এ হচ্ছে তার সম্পর্কে সত্য কথা, যে ব্যাপারে লোকেরা সন্দেহ করছে। কাউকে সন্তান হিসেবে গ্রহণ করা আল্লাহর কাজ নয়। তিনি পবিত্র সত্তা। তিনি যখন কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেন তখন বলেন, হয়ে যাও, অমনি তা হয়ে যায়।[২২]

বনী ইসরাঈলের পবিত্রতম ঘরানা হারুন বংশের একটি মেয়েকে এ অবস্থায় পাওয়া গেছে। যদিও একটি মারফূ হাদীসের উপস্থিতিতে অন্য কোনো ব্যাখ্যা ও অর্থ গ্রহণ করা নীতিগতভাবে সঠিক হতে পারে না তবুও মুসলিম, নাসাঈ ও তিরমিযীতে এ হাদীসটি যে সব শব্দসহকারে উদ্ধৃত হয়েছে তা থেকে এ অর্থ বের হয় না যে, এ শব্দগুলোর অর্থ অবশ্যই "হারুনের বোন"ই হবে। মুগীরা ইবনে শু'বা (রা) বর্ণিত হাদীসে যা কিছু বলা হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, নাজরানের খৃষ্টানরা হযরত মুগীরার সামনে আপত্তি উত্থাপন করে বলে,

কুরআনে হযরত মারয়ামকে হারুনের বোন বলা হয়েছে, অথচ হযরত হারুন তাঁর শত শত বছর আগে দুনিয়ার বুক থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। হযরত মুগীরা তাদের এ আপত্তির জবাব দিতে পারেননি এবং তিনি এসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে এ ঘটনাটি বলেন। তাঁর কথা শুনার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "তুমি এ জবাব দাওনি কেন যে, বনী ইসরাঈলরা নবী ও সৎ লোকদের সাথে যুক্ত করে নিজেদের নাম রাখতো ?" নবীর (স) এ উক্তি থেকে শুধুমাত্র এতটুকুই বক্তব্য পাওয়া যায় যে, লা জওয়াব হওয়ার চাইতে অন্তত এ জওয়াবটি দিয়ে আপত্তি দূর করা যেতে পারতো।

১৯(ক). যারা হযরত ঈসা (আ)-এর অলৌকিক জন্ম অস্বীকার করে তাঁরা একথার কি যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা দিতে পারে যে, হযরত মারয়ামকে শিশু সন্তান কোলে করে নিয়ে আসতে দেখে তার জাতির লোকেরা তাঁকে এক নাগাড়ে তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করতে লাগলো কেন ?

২০. কুরআনের অর্থ বিকৃতকারীরা এ আয়াতের এ অর্থ নিয়েছে, "কালকের শিশুর সাথে আমরা কি কথা বলবো ?" অর্থাৎ তাদের মতে এ কথাবার্তা হয়েছিল হযরত ঈসার যৌবন কালে। তখন বনী ইসরাঈলের নেতৃ পর্যায়ের বড় বড় লোকেরা বলেছিল, আমরা এ ছেলেটির সাথে কি কথা বলবো যে কালই আমাদের সামনে দোলনায় শুয়েছিল ? কিন্তু পরিবেশ পরিস্থিতি ও পূর্বাপর আলোচনার প্রতি লক্ষ রেখে সামান্য চিন্তা-ভাবনা করলে যে কোনো ব্যক্তিই উপলব্ধি করতে পারবে যে, এটি নিছক একটি বাজে ও অযৌক্তিক ব্যাখ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়। শুধুমাত্র অলৌকিকতাকে এড়িয়ে চলার জন্য এ পথ অবলম্বন করা হয়েছে। অন্য কিছু না হলেও এই জালেমরা অন্তত এতটুকু চিন্তা করতো যে, তারা যে বিষয়টির ওপর আপত্তি জানাতে এসেছিল তাতো শিশুর জন্মের সময়কার ব্যাপার, তার কৈশোর বা যৌবনকালের ব্যাপার নয়। তাছাড়া সূরা আলে ইমরানের ৪৬ এবং সূরা মায়েদার ১১০ আয়াত দুটি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ব্যক্ত করছে যে, হযরত ঈসা তাঁর যৌবনে নয় বরং মায়ের কোলে সদ্যজাত শিশু থাকা অবস্থায় একথা বলেছিলেন। প্রথম আয়াতে ফেরেশতা হযরত মারয়ামকে শিশু জন্মের সুসংবাদ দান করে বলছেন সে দোলনায় শায়িত অবস্থায় লোকদের সাথে কথা বলবে এবং যৌবনে পদার্পণ করেও। দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ নিজেই হযরত ঈসাকে বলছেন, তুমি দোলনায় থাকা অবস্থায় লোকদের সাথে কথা বলতে এবং যৌবনকালেও।

২০(ক). পিতামাতার হক আদায়কারী বলেননি, শুধুমাত্র মাতার হক আদায়কারী বলেছেন। একথাটিও হযরত ঈসার কোনো পিতা ছিল না একথাই প্রমাণ করে। আর কুরআনের সর্বত্র তাঁকে মারয়াম পুত্র ঈসা বলা হয়েছে, এও এরি একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ।

২১. এটিই সেই নিদর্শন হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের সত্তার মাধ্যমে যা বনী ইসরাঈলদের সামনে পেশ করা হয়েছিল। বনী ইসরাঈলের অব্যাহত দুষ্কৃতির কারণে আল্লাহ তাদেরকে কঠোর শাস্তি দেয়ার আগে তাদের সামনে সত্যকে পুরোপুরি ও চূড়ান্তভাবে পেশ করতে চাচ্ছিলেন। এ জন্য তিনি যে কৌশল অবলম্বন করেন তা হচ্ছে এই যে, হারুন গোত্রের এমন এক মুত্তাকী, ধর্মনিষ্ঠ ও ইবাদাতগুজার মেয়েকে, যিনি বাইতুলমাকদিসে ই'তিকাফরত এবং হযরত যাকারিয়ার প্রশিক্ষণাধীন ছিলেন, তাঁর কুমারী

وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۚ هَٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٣٦﴾ فَاخْتَلَفَ
الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ ۖ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٣٧﴾
أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا ۖ لَٰكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ
مُبِينٍ ﴿٣٨﴾ وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ
وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٩﴾ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا
يُرْجَعُونَ ﴿٤٠﴾

আর (ঈসা বলেছিল) "আল্লাহ আমার রব এবং তোমাদেরও রব। কাজেই তোমরা তার বন্দেগী করো। এটিই সোজা পথ।"[২৩] কিন্তু তারপর বিভিন্ন দল[২৪] পরস্পর মতবিরোধ করতে থাকলো। যারা কুফরী করলো তাদের জন্য সে সময়টি হবে বড়ই ধ্বংসকর যখন তারা একটি মহাদিবস দেখবে। যখন তারা আমার সামনে হাযির হবে সেদিন তাদের কানও খুব স্পষ্ট শুনবে এবং তাদের চোখও খুব স্পষ্ট দেখবে কিন্তু আজ এ যালেমরা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে লিপ্ত। হে মুহাম্মাদ! যখন এরা গাফেল রয়েছে এবং ঈমান আনছে না তখন এ অবস্থায় এদেরকে সেই দিনের ভয় দেখাও যেদিন ফায়সালা করে দেয়া হবে এবং পরিতাপ করা ছাড়া আর কোনো গতি থাকবে না। শেষ পর্যন্ত আমিই হবো পৃথিবী ও তার সমস্ত জিনিসের উত্তরাধিকারী এবং এ সবকিছু আমারই দিকে ফিরিয়ে দেয়া হবে।[২৫]

অবস্থায় গর্ভবতী করে দিলেন। এটা এ জন্য করলেন যে, যখন সে শিশু সন্তান কোলে করে নিয়ে আসবে তখন সমগ্র জাতির মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়ে যাবে এবং আকস্মিকভাবে সবার দৃষ্টি তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হবে। তারপর এ কৌশল অবলম্বন করার ফলে বিপুল সংখ্যক লোক যখন হযরত মারয়ামের চারদিকে ঘিরে দাঁড়ালো তখন আল্লাহ এই নবজাত শিশুর মুখ দিয়ে কথা বলালেন, যাতে এ শিশু বড় হয়ে যখন নবুওয়াতের দায়িত্ব পালন করবে তখন জাতির হাজার হাজার লোক এ মর্মে সাক্ষ দেয়ার জন্য উপস্থিত থাকে যে, এর ব্যক্তিত্বের মধ্যে তারা আল্লাহর একটি বিস্ময়কর অলৌকিকত্ব দেখেছিল। এরপরও এ জাতি যখন তার নবুওয়াত অস্বীকার করবে এবং তার আনুগত্য করার পরিবর্তে তাকে অপরাধী সাজিয়ে শূলবিদ্ধ করার চেষ্টা করবে তখন তাদেরকে এমন কঠোর শাস্তি দেয়া হবে যা দুনিয়ার কোনো জাতিকে দেয়া হয়নি। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল

কুরআন, আলে ইমরান ৪৪ ও ৫৩, আন নিসা ২১২ ও ২১৩, আল আম্বিয়া ৮৮, ৮৯ ও ৯০ এবং আল মু'মিনূন ৪৩ টীকা)।

২২. এ পর্যন্ত খৃষ্টানদের সামনে যে কথাটি সুস্পষ্ট করা হয়েছে সেটি হচ্ছে এই যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহর পুত্র মনে করার যে আকীদা তারা অবলম্বন করছে তা মিথ্যা । যেভাবে একটি মু'জিযার মাধ্যমে হযরত ইয়াহ্ইয়ার জন্মের কারণে তা তাঁকে আল্লাহর পুত্রে পরিণত করেনি ঠিক তেমনিভাবে অন্য একটি মু'জিযার মাধ্যমে হযরত ঈসার জন্মও এমন কোনো জিনিস নয় যে জন্য তাঁকে আল্লাহর পুত্র গণ্য করতে হবে। খৃষ্টানদের নিজেদের বর্ণনাসমূহেও একথা রয়েছে যে, হযরত ইয়াহ্ইয়া ও হযরত ঈসা উভয়েই এক এক ধরনের মু'জিযার মাধ্যমে জন্ম নিয়েছিলেন। লূক লিখিত সুসমাচারে কুরআনের মতো এ উভয়বিধ মু'জিযার উল্লেখ একই বর্ণনা পরম্পরায় করা হয়েছে। কিন্তু এটি খৃষ্টানদের বাড়াবাড়ি যে, তারা একটি মু'জিযার মাধ্যমে সৃষ্ট ব্যক্তিকে আল্লাহর বান্দা বলে এবং অন্য একটি মু'জিযার মাধ্যমে সৃষ্ট ব্যক্তিকে বলে আল্লাহর পুত্র।

২৩. এখানে খৃষ্টানদেরকে জানানো হয়েছে যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের দাওয়াতও তাই ছিল যা অন্য নবীগণ এনেছিলেন। তিনি এছাড়া আর কিছুই শিখাননি যে, কেবলমাত্র এক আল্লাহর বন্দেগী করতে হবে। এখন তোমরা যে তাঁকে বান্দার পরিবর্তে আল্লাহ বানিয়ে নিয়েছো এবং তাঁকে আল্লাহর সাথে ইবাদাতে শরীক করছো এসব তোমাদের নিজেদের উদ্ভট আবিষ্কার। তোমাদের নেতা কখনোই তোমাদের একথা শেখাননি। (আরো বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আলে ইমরান ৬৮, মায়েদাহ ১০০, ১০১ ও ১৩০ এবং আয যুখরুফ ৫৭ ও ৫৮ টীকা)

২৪. অর্থাৎ খৃষ্টানদের দল।

২৫. খৃষ্টানদের শুনাবার জন্য যে ভাষণ অবতীর্ণ হয়েছিল তা এখানে শেষ হয়ে যাচ্ছে। এই ভাষণের মাহাত্ম্য একমাত্র তখনই অনুধাবন করা যেতে পারে যখন এ সূরার ভূমিকায় আমি যে ঐতিহাসিক পটভূমির অবতারণা করেছি তা পাঠকের দৃষ্টি সমক্ষে থাকবে। এ ভাষণ এমন এক সময় অবতীর্ণ হয়েছিল যখন মক্কার মজলুম মুসলমানরা একটি ঈসায়ী রাষ্ট্রে আশ্রয় নিতে যাচ্ছিল। তখন এটি নাযিল করার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, সেখানে যখন ঈসা সম্পর্কে ইসলামী আকীদার প্রশ্ন উত্থাপিত হবে তখন এই "সরকারী" বিজ্ঞপ্তি ঈসায়ীদেরকে শুনিয়ে দেয়া হবে। ইসলাম যে সত্য ও ন্যায়ের ব্যাপারে মুসলমানদেরকে কোনো অবস্থায়ও তোষামোদী নীতি অবলম্বনে উদ্বুদ্ধ করেনি, এর সপক্ষে এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কি হতে পারে ? তারপর যেসব সাচ্চা মুসলমান হাবশায় হিজরত করে গিয়েছিলেন তাদের ঈমানী শক্তিও ছিল বিস্ময়কর। তারা রাজদরবারে এমন এক নাজুক পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে এ বক্তৃতা শুনিয়ে দিয়েছিলেন যখন নাজ্জাশীর দরবারে সভাসদরা উৎকোচ গ্রহণ করে তাদেরকে তাদের শত্রুর হাতে তুলে দেয়ার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল। তখন পূর্ণ আশংকা ছিল, খৃষ্টবাদের বুনিয়াদী আকীদার ওপর ইসলামের এ নিরপেক্ষ আলোচনা শুনে নাজ্জাশীও বিরূপ হয়ে উঠবেন এবং এই মজলুম মুসলমানদেরকে কুরাইশ কসাইদের হাতে সোপর্দ করে দেবেন। কিন্তু এ সত্ত্বেও তারা সত্য কথা বলতে একটুও ইতস্তত করেননি।

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِبْرٰهِيْمَ ۬ اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا ﴿٤١﴾ اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ
يٰۤاَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِيْ عَنْكَ شَيْـًٔا ﴿٤٢﴾ يٰۤاَبَتِ
اِنِّيْ قَدْ جَآءَنِيْ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَاْتِكَ فَاتَّبِعْنِيْۤ اَهْدِكَ صِرَاطًا
سَوِيًّا ﴿٤٣﴾ يٰۤاَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطٰنَ ؕ اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ عَصِيًّا ﴿٤٤﴾
يٰۤاَبَتِ اِنِّيْۤ اَخَافُ اَنْ يَّمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ فَتَكُوْنَ
لِلشَّيْطٰنِ وَلِيًّا ﴿٤٥﴾

৩ রুকূ'

আর এ কিতাবে ইবরাহীমের কথা বর্ণনা করো।[২৬] নিসন্দেহে সে একজন সত্যনিষ্ঠ মানুষ এবং একজন নবী ছিল (এদেরকে সেই সময়ের কথা একটু স্মরণ করিয়ে দাও) যখন সে নিজের বাপকে বললো, "আব্বাজান! আপনি কেন এমন জিনিসের ইবাদাত করেন, যা শোনেও না, দেখেও না এবং আপনার কোনো কাজও করতে পারে না ? আব্বাজান ! আমার কাছে এমন এক জ্ঞান এসেছে যা আপনার কাছে আসেনি, আপনি আমার অনুসরণ করে চলুন, আমি আপনাকে সোজাপথ দেখিয়ে দেবো। আব্বাজান ! আপনি শয়তানের বন্দেগী করবেন না।[২৭] শয়তান তো করুণাময়ের অবাধ্য। আব্বাজান! আমার ভয় হয় আপনি করুণাময়ের আযাবের শিকার হন কি না এবং শয়তানের সাথী হয়ে যান কি না।"

২৬. এখান থেকে মক্কাবাসীদেরকে সম্বোধন করে কথা বলা হচ্ছে। তারা তাদের যুবক পুত্র, ভাই ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনদেরকে ঠিক তেমনিভাবে আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের অপরাধে গৃহত্যাগ করতে বাধ্য করেছিল যেমন হযরত ইবরাহীম (আ)-কে তাঁর বাপ-ভাইয়েরা দেশ থেকে বের করে দিয়েছিল। কুরাইশ বংশের লোকেরা হযরত ইবরাহীমকে নিজেদের নেতা বলে মানতো এবং তাঁর আওলাদ হওয়ার কারণে সারা আরবে গর্ব করে বেড়াতো, এ কারণে অন্য নবীদের কথা বাদ দিয়ে বিশেষ করে হযরত ইবরাহীমের কথা বলার জন্য এখানে নির্বাচিত করা হয়েছে।

২৭. মূল শব্দ হচ্ছে, لَا تَعْبُدِ الشَّيْطٰنَ অর্থাৎ "শয়তানের ইবাদাত করো না।" যদিও হযরত ইবরাহীমের পিতা এবং তাঁর জাতির অন্যান্য লোকেরা মূর্তি পূজা করতো কিন্তু যেহেতু তারা শয়তানের আনুগত্য করছিল তাই হযরত ইবরাহীম তাদের এ শয়তানের আনুগত্যকেও শয়তানের ইবাদাত গণ্য করেন। এ থেকে জানা যায়, ইবাদাত নিছক পূজা

قَالَ أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ ۖ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ ۖ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا ﴿٤٦﴾ قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ ۖ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي ۖ إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ﴿٤٧﴾ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا ﴿٤٨﴾ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۖ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ﴿٤٩﴾ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ﴿٥٠﴾

বাপ বললো, "ইবরাহীম! তুমি কি আমার মাবুদদের থেকে বিমুখ হয়েছো ? যদি তুমি বিরত না হও তাহলে আমি পাথরের আঘাতে তোমাকে শেষ করে দেবো। ব্যাস; তুমি চিরদিনের জন্য আমার থেকে আলাদা হয়ে যাও।"

ইবরাহীম বললো, "আপনাকে সালাম। আমি আমার রবের কাছে আপনাকে মাফ করে দেয়ার জন্য দোয়া করবো।[২৭(ক)] *আমার রব আমার প্রতি বড়ই মেহেরবান। আমি আপনাদেরকে ত্যাগ করছি এবং আপনারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদেরকে ডাকেন তাদেরকেও, আমি তো আমার রবকেই ডাকবো। আশা করি আমি নিজের রবকে ডেকে ব্যর্থ হবো না।"*

অতপর যখন সে তাদের থেকে এবং তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদের ইবাদাত করতো তাদের থেকে আলাদা হয়ে গেলো এবং তখন আমি তাকে ইসহাক ও ইয়াকুবের মতো সন্তান দিলাম এবং প্রত্যেককে নবী করলাম। আর তাদেরকে নিজের অনুগ্রহ দান করলাম এবং তাদেরকে দিলাম যথার্থ নাম-যশ।[২৮]

ও উপাসনা আরাধনারই নাম নয় বরং আনুগত্যের নামও। তাছাড়া এ থেকে এও জানা যায়, যদি কোনো ব্যক্তি কারো প্রতি অভিশাপ বর্ষণরত থেকেও তার আনুগত্য করে তাহলে সে তার ইবাদাত করার অপরাধে অপরাধী হয়। কারণ শয়তান কোনো কালেও মানুষের মাবুদ (প্রচলিত অর্থে) ছিল না বরং তার নামে প্রতি যুগে মানুষ অভিশাপ বর্ষণ করেছে। (অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল কাহফ, ৪৯-৫০)

২৭(ক) ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন আত তাওবা, ১১২ টীকা।

২৮ যেসব মুহাজির গৃহ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন এগুলো তাদের জন্য সান্ত্বনাবাণী। তাদেরকে বলা হচ্ছে, ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যেমন তাঁর পরিবারবর্গ থেকে

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ مُوسٰى ۚ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَّكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ﴿٥١﴾
وَنَادَيْنٰهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنٰهُ نَجِيًّا ﴿٥٢﴾ وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ
رَّحْمَتِنَآ أَخَاهُ هٰرُونَ نَبِيًّا ﴿٥٣﴾ وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ إِسْمٰعِيلَ ۚ إِنَّهُ كَانَ
صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ﴿٥٤﴾ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلٰوةِ
وَالزَّكٰوةِ ۖ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ﴿٥٥﴾ وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ إِدْرِيسَ ۚ إِنَّهُ
كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا ﴿٥٦﴾ وَّرَفَعْنٰهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿٥٧﴾

৪ রুকূ'

আর এ কিতাবে মূসার কথা স্মরণ করো। সে ছিল এক বাছাই করা ব্যক্তি[২৯] এবং ছিল রাসূল-নবী।[৩০] আমি তাকে তূরের ডান দিক থেকে ডাকলাম[৩১] এবং গোপন আলাপের মাধ্যমে তাকে নৈকট্য দান করলাম।[৩২] আর নিজ অনুগ্রহে তার ভাই হারুনকে নবী বানিয়ে তাকে সাহায্যকারী হিসেবে দিলাম।

আর এ কিতাবে ইসমাঈলের কথা স্মরণ করো। সে ছিল ওয়াদা পালনে সত্যনিষ্ঠ এবং ছিল রাসূল-নবী। সে নিজের পরিবারবর্গকে নামায ও যাকাতের হুকুম দিতো এবং নিজের রবের কাছে ছিল একজন পসন্দনীয় ব্যক্তি।

আর এ কিতাবে ইদরীসের কথা স্মরণ করো।[৩৩] সে একজন সত্যনিষ্ঠ মানুষ এবং একজন নবী। আর তাকে আমি উঠিয়েছিলাম উন্নত স্থানে।[৩৪]

বিচ্ছিন্ন হয়ে ধ্বংস হয়ে যান নি বরং উলটা উন্নতশির ও সফলকাম হয়েছিলেন ঠিক তেমনি তোমরাও ধ্বংস হয়ে যাবে না বরং তোমরা এমন মর্যাদা লাভ করবে, জাহেলিয়াতের অন্ধকার আবর্তে মুখ গুজে পড়ে থাকা কুরাইশ বংশীয় কাফেররা যার কল্পনাই করতে পারে না।

২৯. মূলে مُخْلَصَ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর মানে হচ্ছে "একান্ত করে নেয়া।" অর্থাৎ হযরত মূসা এমন এক ব্যক্তি ছিলেন যাকে আল্লাহ একান্তভাবে নিজের করে নিয়েছিলেন।

৩০. "রসূল" মানে প্রেরিত। এই মানের দিক দিয়ে আরবী ভাষায় দূত, পয়গম্বর, বার্তাবাহক ও রাজদূতের জন্য এ শব্দটি ব্যবহার করা হয়। আর কুরআনে এ শব্দটি এমন সব ফেরেশতার জন্যও ব্যবহার করা হয়েছে যাদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ

কাজে নিযুক্ত করা হয় অথবা এমনসব মানুষকে এ নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে যাদেরকে আল্লাহ সৃষ্টির কাছে নিজের বাণী পৌছানোর জন্য নিযুক্ত করেন।

"নবী" শব্দটি অর্থের ব্যাপারে অভিধানবিদদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ একে نَبَأ শব্দ থেকে গঠিত বলেন। এ ক্ষেত্রে এর অর্থ হয় খবর। এই মূল অর্থের দিকে দিয়ে নবী মানে হয় "খবর প্রদানকারী।" আবার কেউ কেউ বলেন, نُبُو ধাতু থেকে নবী শব্দের উৎপত্তি। এর অর্থ উন্নতি ও উচ্চতা। এ অর্থের দিক দিয়ে এর মানে হয় "উন্নত মর্যাদা" ও "সুউচ্চ অবস্থান"। আযহারী কিসায়ী থেকে তৃতীয় একটি উক্তি উদ্বৃত করেছেন। সেটি হচ্ছে এই যে, এ শব্দটি মূলত نَبِى থেকে এসেছে। এর মানে হচ্ছে পথ। আর নবীদেরকে নবী এজন্য বলা হয়েছে যে, তাঁরা হচ্ছেন আল্লাহর দিকে যাবার পথ।

কাজেই কোনো ব্যক্তিকে "রসূল নবী" বলার অর্থ হবে "উন্নত মর্যাদাশালী পয়গম্বর অথবা "আল্লাহর পক্ষ থেকে খবর দানকারী পয়গম্বর" কিংবা "এমন পয়গম্বর যিনি আল্লাহর পথ বাতলে দেন।"

কুরআন মজীদে এ দু'টি শব্দ সাধারণত একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই আমরা দেখি একই ব্যক্তিকে কোথাও শুধু নবী বলা হয়েছে এবং কোথাও শুধু রসূল বলা হয়েছে আবার কোথাও রসূল ও নবী এক সাথে বলা হয়েছে। কিন্তু কোনো কোনো জায়গায় রসূল ও নবী শব্দ দু'টি এমনভাবেও ব্যবহৃত হয়েছে যা থেকে প্রকাশ হয় যে, এ উভয়ের মধ্যে মর্যাদা বা কাজের ধরনের দিক দিয়ে কোনো পারিভাষিক পার্থক্য রয়েছে। যেমন সূরা হজ্জের ৭ রুকূতে বলা হয়েছে ঃ

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ وَّلاَ نَبِيٍّ اِلاَّ ....

"আমি তোমার আগে এমন কোনো রসূলও পাঠাইনি এবং এমন কোনো নবীও পাঠাইনি, যে, ..." একথাগুলো পরিষ্কার প্রকাশ করছে যে, রসূল ও নবী দুটি আলাদা পরিভাষা এবং এদের মধ্যে নিশ্চয়ই কোনো আভ্যন্তরীণ পার্থক্য আছে। এরি ভিত্তিতে এ পার্থক্যের ধরনটা কি এ নিয়ে তাফসীরকারদের মধ্যে বিতর্ক দেখা দিয়েছে। কিন্তু আসলে চূড়ান্ত ও অভ্রান্ত দলীল প্রমাণের সাহায্যে কেউই রসূল ও নবীর পৃথক মর্যাদা চিহ্নিত করতে পারেননি। বড়জোর এখানে এতটুকু কথা নিশ্চয়তা সহকারে বলা যেতে পারে যে, রসূল শব্দটি নবীর তুলনায় বিশিষ্টতা সম্পন্ন। অর্থাৎ প্রত্যেক রসূল নবী হন কিন্তু প্রত্যেক নবী রসূল হন না। অন্য কথায় নবীদের মধ্যে রসূল শব্দটি এমন সব নবীর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে যাদেরকে সাধারণ নবীদের তুলনায় বেশী গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছিল। একটি হাদীসও এ বক্তব্য সমর্থন করে। হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন ইমাম আহমদ হযরত আবু উমামাহ থেকে এবং হাকেম হযরত আবু যার (রা) থেকে। এতে বলা হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রসূলদের সংখ্যার ব্যাপারে প্রশ্ন করা হয়। তিনি বলেন, ৩১৩ বা ৩১৫ এবং নবীদের সংখ্যা জিজ্ঞেস করা হলে বলেন, এক লাখ চব্বিশ হাজার। যদিও হাদীসটির সনদ দুর্বল কিন্তু কয়েকটি সনদের মাধ্যমে একই কথার বর্ণনা কথাটির দুর্বলতা অনেকাংশে কমিয়ে দেয়।

৩১. তূর পাহাড়ের ডান দিক থেকে বলতে পূর্ব পাদদেশ বুঝানো হয়েছে। যেহেতু হযরত মূসা (আ) মাদইয়ান থেকে মিসর যাবার পথে এ তূর পাহাড়ের দক্ষিণ পাশের পথ দিয়ে এগিয়ে চলছিলেন এবং দক্ষিণ দিক থেকে কোনো ব্যক্তি তূরকে দেখলে তার ডান দিক হবে পূর্ব এবং বাম দিক হবে পশ্চিম, তাই হযরত মূসার সাথে সম্পর্কিত করে তূরের পূর্ব পাদদেশকে "ডান দিক" বলা হয়েছে। অন্যথায় একথা সুস্পষ্ট যে, পাহাড়ের কোনো ডানদিক বা বাম দিক হয় না।

৩২. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আন নিসা ২০৬ টীকা।

৩৩. হযরত ইদরীস (আ)-এর ব্যাপারে মতবিরোধ আছে। কারোর মতে তিনি বনী ইসরাঈলের নবী ছিলেন। কিন্তু অধিকাংশের মতে তিনি নূহের (আ)-ও পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এমন কোনো সহীহ হাদীস আমরা পাইনি যা তাঁর সঠিক পরিচয় নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে কোনো প্রকার সাহায্য করতে পারে। তবে হ্যাঁ, কুরআনের একটি ইংগিত এ ধারণার প্রতি সমর্থন যোগায় যে, তিনি নূহ (আ)-এর পূর্বগামী ছিলেন। কারণ পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে, এ নবীগণ (উপরে যাদের কথা বলা হয়েছে।) আদমের সন্তান, নূহের সন্তান, ইবরাহীমের সন্তান এবং ইসরাঈলের সন্তান। এখন একথা সুস্পষ্ট যে, হযরত ইয়াহ্ইয়া, হযরত ঈসা ও হযরত মূসা আলাইহিমুস সালাম বনী ইসরাঈলের অন্তরভুক্ত, হযরত ইসমাঈল, হযরত ইসহাক ও হযরত ইয়াকুব আলাইহিমুস সালাম ইবরাহীমের সন্তানদের অন্তরভুক্ত এবং হযরত ইবরাহীম (আ) নূহের সন্তানদের অন্তরভুক্ত। এরপর থেকে যান কেবলমাত্র হযরত ইদরীস (আ)। তাঁর সম্পর্কে ধারণা করা যেতে পারে যে, তিনি আদমের (আ) সন্তানদের অন্তরভুক্ত।

মুফাসসিরগণ সাধারণভাবে একথা মনে করেন যে, বাইবেলে যে মনীষীকে হনোক (Enoch) বলা হয়েছে তিনিই হযরত ইদরীস আলাইহিস সালাম। তাঁর সম্পর্কে বাইবেলের বর্ণনা হচ্ছে ঃ

> "আর হনোক পঁয়ষট্টি বৎসর বয়সে মথুশেলহের জন্ম দিলেন। মথুশেলহের জন্ম দিলে পর হনোক তিন শত বৎসর ঈশ্বরের সহিত গমনাগমন করিলেন।....পরে তিনি আর রহিলেন না, কেন না ঈশ্বর তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন।" (আদি পুস্তক ৫ ঃ ২১-২৪)

তালমূদের ইসরাঈলী বর্ণনায় তাঁর অবস্থা আরো বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে। এই বর্ণনার সংক্ষিপ্তসার হচ্ছে ঃ হযরত নূহের পূর্বে যখন আদম সন্তানদের মধ্যে বিকৃতির সূচনা হলো তখন আল্লাহর ফেরেশতারা হনোককে, যিনি জনসমাজ ত্যাগ করে নির্জনে ইবাদাত বন্দেগী করে জীবন অতিবাহিত করছিলেন, ডেকে বললেন, "হে হনোক! ওঠো, নির্জনবাস থেকে বের হও এবং পৃথিবীর অধিবাসীদের মধ্যে চলাফেরা এবং তাদের সাথে ওঠাবসা করে যে পথে তাদের চলা উচিত এবং যেভাবে তাদের কাজ করতে হবে তা তাদেরকে জানিয়ে দাও।" এ হুকুম পেয়ে তিনি বের হলেন। তিনি বিভিন্ন জায়গায় লোকদেরকে একত্র করে নসীহত করলেন ও নির্দেশ দিলেন এবং মানব সন্তানরা তাঁর আনুগত্য করে আল্লাহর বন্দেগীর পথ অবলম্বন করলো। হনোক ৩৫৩ বছর পর্যন্ত মানব সম্প্রদায়ের ওপর শাসন কর্তৃত্ব চালান। তাঁর শাসন ছিল ইনসাফ ও সত্যপ্রীতির শাসন। তাঁর শাসনামলে পৃথিবীর ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ বর্ষিত হতে থাকে।" (The Talmud Salections, pp. 18-21)

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا ۚ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَٰنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا ۩ ﴿٥٨﴾ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ ۖ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴿٥٩﴾ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ﴿٦٠﴾

এরা হচ্ছে এমন সব নবী, যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছিলেন আদম সন্তানদের মধ্য থেকে এবং যাদেরকে আমি নূহের সাথে নৌকায় আরোহণ করিয়েছিলাম তাদের বংশধরদের থেকে, আর ইবরাহীমের বংশধরদের থেকে ও ইসরাঈলের বংশধরদের থেকে, আর এরা ছিল তাদের মধ্য থেকে যাদেরকে আমি সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছিলাম এবং বাছাই করে নিয়েছিলাম। এদের অবস্থা এই ছিল যে, যখন করুণাময়ের আয়াত এদেরকে শুনানো হতো তখন কান্নারত অবস্থায় সিজদায় লুটিয়ে পড়তো।

তারপর এদের পর এমন নালায়েক লোকেরা এদের স্থলাভিষিক্ত হলো যারা নামায নষ্ট করলো[৩৫] এবং প্রবৃত্তির কামনার দাসত্ব করলো।[৩৬] তাই শীঘ্রই তারা গোমরাহীর পরিণামের মুখোমুখি হবে। তবে যারা তাওবা করবে, ঈমান আনবে এবং সৎকাজ করবে, তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের সামান্যতম অধিকারও ক্ষুণ্ন হবে না।

৩৪. এর সোজা অর্থ হচ্ছে আল্লাহ হযরত ইদরীস (আ)-কে উন্নত মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছিলেন। ইসরাঈলী বর্ণনাসমূহ থেকে স্থানান্তরিত হয়ে একথা আমাদের এখানেও প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে যে, আল্লাহ হযরত ইদরীস (আ)-কে আকাশে তুলে নিয়েছিলেন, বাইবেলে তো শুধু এতটুকু বলা হয়েছে যে, তিনি অদৃশ্য হয়ে গেছেন কারণ "আল্লাহ তাঁকে উঠিয়ে নিয়েছেন।" কিন্তু তালমুদে তার সম্পর্কে একটি দীর্ঘ কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। কাহিনীটি এভাবে শেষ করা হয়েছে যে, "হনোক একটি ঘূর্ণির মধ্যে অগ্নিরথ ও অশ্বসহ আকাশে আরোহণ করলেন।"

৩৫. অর্থাৎ নামায পড়া ত্যাগ করলো অথবা নামায থেকে গাফেল ও বেপরোয়া হয়ে গেলো। এটি প্রত্যেক উম্মতের পতন ও ধ্বংসের প্রথম পদক্ষেপ। নামায আল্লাহর সাথে

جَنّٰتِ عَدْنِ ۣالَّتِیْ وَعَدَ الرَّحْمٰنُ عِبَادَهٗ بِالْغَیْبِ ؕ اِنَّهٗ كَانَ وَعْدُهٗ مَاْتِیًّا ۞ لَا یَسْمَعُوْنَ فِیْهَا لَغْوًا اِلَّا سَلٰمًا ؕ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِیْهَا بُكْرَةً وَّعَشِیًّا ۞ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِیْ نُوْرِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِیًّا ۞ وَمَا نَتَنَزَّلُ اِلَّا بِاَمْرِ رَبِّكَ ۚ لَهٗ مَا بَیْنَ اَیْدِیْنَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَیْنَ ذٰلِكَ ۚ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِیًّا ۞ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَیْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهٖ ؕ هَلْ تَعْلَمُ لَهٗ سَمِیًّا ۞

তাদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী জান্নাত, যার প্রতিশ্রুতি করুণাময় নিজের বান্দাদের কাছে অদৃশ্য পন্থায় দিয়ে রেখেছেন।[৩৭] আর অবশ্যই এ প্রতিশ্রুতি পালিত হবেই। সেখানে তারা কোনো বাজে কথা শুনবে না, যা কিছুই শুনবে ঠিকই শুনবে।[৩৮] আর সকাল-সন্ধ্যায় তারা অনবরত নিজেদের রিযিক লাভ করতে থাকবে। এ হচ্ছে সেই জান্নাত, যার উত্তরাধিকারী করবো আমি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে মুত্তাকীদেরকে।

হে মুহাম্মাদ![৩৯] আমি আপনার রবের হুকুম ছাড়া অবতরণ করি না। যাকিছু আমাদের সামনে ও যাকিছু পেছনে এবং যাকিছু এর মাঝখানে আছে তার প্রত্যেকটি জিনিসের তিনিই মালিক এবং আপনার রব ভুলে যান না। তিনি আসমান ও যমীনের এবং এ দুয়ের মাঝখানে যাকিছু আছে সবকিছুর রব। কাজেই আপনি তার বন্দেগী করুন এবং তার বন্দেগীর ওপর অবিচল থাকুন।[৪০] আপনার জানামতে তাঁর সমকক্ষ কোনো সত্তা আছে কি?[৪১]

মু'মিনের প্রথম ও প্রধানতম জীবন্ত ও কার্যকর সম্পর্ক জুড়ে রাখে। এ সম্পর্ক তাকে আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের কেন্দ্র বিন্দু থেকে বিচ্যুত হতে দেয় না। এ বাঁধন ছিন্ন হওয়ার সাথে সাথেই মানুষ আল্লাহ থেকে দূরে বহুদূরে চলে যায়। এমনকি কার্যকর সম্পর্ক খতম হয়ে গিয়ে মানসিক সম্পর্কেরও অবসান ঘটে। তাই আল্লাহ একটি সাধারণ নিয়ম হিসেবে এখানে একথাটি বর্ণনা করেছেন যে, পূর্ববর্তী সকল উম্মতের বিকৃতি শুরু হয়েছে নামায নষ্ট করার পর।

৩৬. এটি আল্লাহর সাথে সম্পর্কের অভাব ও এর শূন্যতার অনিবার্য ফল। নামায ছেড়ে দেয়ার পর যখন আল্লাহর স্মরণ থেকে মন গাফেল হয়ে যেতে থাকে তখন যতই এ

গাফলতি বাড়তে থাকে ততই প্রবৃত্তির কামনার পূজাও বেড়ে যেতে থাকে। শেষ পর্যন্ত নৈতিক চরিত্র ও ব্যবহারিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর হুকুমের পরিবর্তে নিজের মনগড়া পদ্ধতির অনুসারী হয়ে যায়।

৩৭. অর্থাৎ যার প্রতিশ্রুতি করুণাময় এমন অবস্থায় দিয়েছেন যখন ঐ জান্নাতসমূহ তাদের দৃষ্টির অগোচরে রয়েছে।

৩৮. মূলে "সালাম" শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর মানে হচ্ছে দোষ-ত্রুটিমুক্ত। জান্নাতে মানুষ যে সমস্ত নিয়ামত লাভ করবে তার মধ্যে একটি বড় নিয়ামত হবে এই যে, সেখানে কোনো আজেবাজে, অর্থহীন ও কটূ কথা শোনা যাবে না। সেখানকার সমগ্র সমাজ হবে পাক-পবিত্র, পরিচ্ছন্ন ও ক্লেদমুক্ত। প্রত্যেক ব্যক্তির প্রকৃতিই হবে ভারসাম্যপূর্ণ। সেখানকার বাসিন্দারা পরনিন্দা, পরচর্চা, গালিগালাজ, অশ্লীল গান ও অন্যান্য অশালীন ধ্বনি একেবারেই শুনবে না। সেখানে মানুষ শুধুমাত্র ভালো, ন্যায়সংগত ও যথার্থ কথাই শুনবে। এ দুনিয়ায় যে ব্যক্তি একটি যথার্থ পরিচ্ছন্ন ও শালীন রুচির অধিকারী একমাত্র সে-ই এ নিয়ামতের কদর বুঝতে পারে। কারণ একমাত্র সে-ই অনুভব করতে পারে যে, মানুষের জন্য এমন একটি পূতিগন্ধময় সমাজে বাস করা কত বড় বিপদ যেখানে কোনো মুহূর্তেই তার কান মিথ্যা, পরনিন্দা, ফিতনা, ফাসাদ, অশ্লীল, অশালীন ও যৌন উত্তেজক কথাবার্তা থেকে সংরক্ষিত থাকে না।

৩৯. এ সম্পূর্ণ প্যারাগ্রাফটি একটি প্রাসংগিক বাক্য। একটি ধারাবাহিক বক্তব্য শেষ করে অন্য একটি ধারাবাহিক বক্তব্য শুরু করার আগে এটি বলা হয়েছে। বক্তব্য উপস্থাপনার ধরন পরিষ্কার জানিয়ে দিচ্ছে যে, এ সূরাটি দীর্ঘকাল পরে এমন এক সময় নাযিল হয় যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ অত্যন্ত দুর্ভাবনা ও দুশ্চিন্তার মধ্যে সময় অতিবাহিত করছিলেন। নবী (স) ও তাঁর সাহাবীগণ সর্বক্ষণ অহীর অপেক্ষা করতেন। এর সাহায্যে তাঁরা নিজেদের পথের দিশা পেতেন এবং মানসিক প্রশান্তি ও সান্ত্বনাও লাভ করতেন। অহীর আগমনে যতই বিলম্ব হচ্ছিল ততই তাদের অস্থিরতা বেড়ে যাচ্ছিল। এ অবস্থায় জিব্রীল আলাইহিস সালাম ফেরেশতাদের সাহচর্যে আগমন করলেন। প্রথমে তিনি তাৎক্ষণিক প্রয়োজনীয় বিষয় সম্পর্কিত ফরমান শুনালেন তারপর সামনের দিকে অগ্রসর হবার আগে আল্লাহর ইংগিতে নিজের পক্ষ থেকে একথা ক'টি বললেন। এ কথা ক'টির মধ্যে রয়েছে এত দীর্ঘকাল নিজের গরহাজির থাকার ওজর, আল্লাহর পক্ষ থেকে সান্ত্বনাবাণী এবং এ সংগে সবর ও সংযম অবলম্বন করার উপদেশ ও পরামর্শ।

বক্তব্যের অভ্যন্তর থেকেই শুধু এ সাক্ষের প্রকাশ হচ্ছে না বরং বিভিন্ন হাদীসও এর সমর্থন করছে। ইবনে জারীর, ইবনে কাসীর ও রূহুল মা'আনী ইত্যাদির লেখকগণ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় এ হাদীসগুলো উদ্ধৃত করেছেন।

৪০. অর্থাৎ তাঁর বন্দেগীর পথে মজবুতভাবে এগিয়ে চলো এবং এ পথে যেসব সংকট সমস্যা ও বিপদ আসে সবরের সাথে সেসবের মোকাবিলা করো। যদি তাঁর পক্ষ থেকে স্মরণ করা এবং সাহায্য ও সান্ত্বনা দেয়ার ব্যাপারে কখনো বিলম্ব হয় তাহলে তাতে ভীত হয়ো না। একজন অনুগত বান্দার মতো সব অবস্থায় তাঁর ইচ্ছার ওপর সন্তুষ্ট

وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ﴿٦٦﴾ أَوَلَا يَذْكُرُ
الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ﴿٦٧﴾ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ
وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ﴿٦٨﴾ ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ
شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَٰنِ عِتِيًّا ﴿٦٩﴾ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ
أَوْلَىٰ بِهَا صِلِيًّا ﴿٧٠﴾ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ﴿٧١﴾
ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوا وَّنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ﴿٧٢﴾

৫ রুকূ’

মানুষ বলে, সত্যিই কি যখন আমি মরে যাবো তখন আবার আমাকে জীবিত করে বের করে আনা হবে ? মানুষের কি স্মরণ হয় না, আমি আগেই তাকে সৃষ্টি করেছি যখন সে কিছুই ছিল না ? তোমার রবের কসম, আমি নিশ্চয়ই তাদেরকে এবং তাদের সাথে শয়তানদেরকেও ঘেরাও করে আনবো,[৪২] তারপর তাদেরকে এনে জাহান্নামের চারদিকে নতজানু করে ফেলে দেবো। তারপর প্রত্যেক দলের মধ্যে যে ব্যক্তি করুণাময়ের বেশী অবাধ্য ও বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল তাকে ছেঁটে বের করে আনবো।[৪৩] তারপর আমি জানি তাদের মধ্য থেকে কারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবার বেশী হকদার। তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে, জাহান্নাম অতিক্রম করবে না।[৪৪] এতো একটা স্থিরীকৃত ব্যাপার, যা সম্পন্ন করা তোমার রবের দায়িত্ব। তারপর যারা (দুনিয়ায়) মুত্তাকী ছিল তাদেরকে আমি বাঁচিয়ে নেবো এবং যালেমদেরকে তার মধ্যে নিক্ষিপ্ত অবস্থায় রেখে দেবো।

থাকো এবং একজন বান্দা ও রসূল হিসেবে তোমার ওপর যে দায়িত্বভার অর্পিত হয়েছে দৃঢ় সংকল্প সহকারে তা পালন করতে থাকো।

৪১. মূলে سَمِيّ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, "সমনাম"। অর্থাৎ আল্লাহ তো হচ্ছেন ইলাহ, তোমাদের জানা মতে দ্বিতীয় কোনো ইলাহ আছে কি ? যদি না থেকে থাকে এবং তোমরা জানো যে নেই, তাহলে তোমাদের জন্য তাঁরই বন্দেগী করা এবং তাঁরই হুকুমের দাস হয়ে থাকা ছাড়া অন্য কোনো পথ থাকে কি ?

৪২. অর্থাৎ সেসব শয়তানকে, যাদের এরা চেলা হয়ে গেছে, যাদের প্ররোচনায় পড়ে এরা মনে করে নিয়েছে এ জীবনে যা কিছু আছে ব্যস এ দুনিয়ার জীবন পর্যন্ত সব শেষ,

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿٧٣﴾ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا ﴿٧٤﴾ قُلْ مَن كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا ۚ حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا ﴿٧٥﴾ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى ۗ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا ﴿٧٦﴾ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا ﴿٧٧﴾ أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَٰنِ عَهْدًا ﴿٧٨﴾

এদেরকে যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াত শুনানো হয় তখন অস্বীকারকারীরা ঈমানদারদেরকে বলে, "বলো, আমাদের দু' দলের মধ্যে কে ভালো অবস্থায় আছে এবং কার মজলিসগুলো বেশী জাঁকালো ?"[৪৫] অথচ এদের আগে আমি এমন কত জাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছি যারা এদের চেয়ে বেশী সাজ-সরঞ্জামের অধিকারী ছিল এবং বাহ্যিক শান-শওকতের দিক দিয়েও ছিল এদের চেয়ে বেশী অগ্রসর। এদেরকে বলো, যে ব্যক্তি গোমরাহীতে লিপ্ত হয় করুণাময় তাকে ঢিল দিতে থাকেন, এমনকি এ ধরনের লোকেরা যখন এমন জিনিস দেখে নেয় যার ওয়াদা তাদের সাথে করা হয়—তা আল্লাহর আযাব হোক বা কিয়ামতের সময়—তখন তারা জানতে পারে, কার অবস্থা খারাপ এবং কার দল দুর্বল! বিপরীত পক্ষে যারা সত্য-সঠিক পথ অবলম্বন করে আল্লাহ তাদেরকে সঠিক পথে চলার ক্ষেত্রে উন্নতি দান করেন[৪৬] এবং স্থায়িত্বলাভকারী সৎকাজগুলোই তোমার রবের প্রতিদান ও পরিণামের দিক দিয়ে ভালো।

তারপর তুমি কি দেখেছো সে লোককে যে আমার আয়াতসমূহ মেনে নিতে অস্বীকার করে এবং বলে, আমাকে তো ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দান করা হতে থাকবেই ?[৪৭] সে কি গায়েবের খবর জেনে গেছে অথবা সে রহমানের থেকে কোনো প্রতিশ্রুতি নিয়ে রেখেছে ?

كَلَّا ۚ سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ﴿٧٩﴾ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا ﴿٨٠﴾ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِّيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ﴿٨١﴾ كَلَّا ۚ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴿٨٢﴾

—কখ্‌খনো নয়, সে যাকিছু বলছে তা আমি লিখে নেবো[৪৮] এবং তার জন্য আযাবের পসরা আরো বাড়িয়ে দেবো। যে সাজ-সরঞ্জাম ও জনবলের কথা এ ব্যক্তি বলছে তা সব আমার কাছেই থেকে যাবে এবং সে একাকী আমার সামনে হাযির হয়ে যাবে।

এরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে নিজেদের কিছু খোদা বানিয়ে রেখেছে, যাতে তারা এদের পৃষ্ঠপোষক হয়।[৪৯] কেউ পৃষ্ঠপোষক হবে না। তারা সবাই এদের ইবাদাতের কথা অস্বীকার করবে[৫০] এবং উল্‌টো এদের বিরোধী হয়ে পড়বে।

এরপর আর দ্বিতীয় কোনো জীবন নেই যেখানে আমাদের আল্লাহর সামনে হাযির হতে এবং নিজেদের কাজের হিসেবে দিতে হবে।

৪৩. অর্থাৎ অবাধ্য ও বিদ্রোহী দলের নেতা।

৪৪. অতিক্রম করা মানে কোনো কোনো রেওয়ায়াতে প্রবেশ করা বলা হয়েছে। কিন্তু এই রেওয়ায়াতগুলোর কোনোটির সনদও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত নির্ভরযোগ্য বর্ণনা পরম্পরায় পৌঁছেনি। আবার একথাটি কুরআন মজীদ এবং বিপুল সংখ্যক সহী হাদীসেরও বিরোধী, যেগুলোতে সৎকর্মশীল মু'মিনদের জাহান্নামে প্রবেশ না করার কথা চূড়ান্তভাবে বলে দেয়া হয়েছে। তাছাড়া কুরআনে উল্লেখিত মূল শব্দ ورود এর আভিধানিক অর্থও প্রবেশ করা নয়। তাই এটিই এর সঠিক অর্থ যে, সবাইকেই জাহান্নাম অতিক্রম করতে হবে। কিন্তু যেমন পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে, মুত্তাকীদেরকে তা থেকে বাঁচিয়ে নেয়া হবে এবং জালেমদেরকে তার মধ্যে ফেলে দেয়া হবে।

৪৫. অর্থাৎ তাদের যুক্তি ছিল এ রকম ঃ দেখে নাও দুনিয়ায় কার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও নিয়ামত বর্ষণ করা হচ্ছে ? কার গৃহ বেশী জমকালো ? কার জীবন যাত্রার মান বেশী উন্নত ? কার মজলিসগুলো বেশী আড়ম্বরপূর্ণ ? যদি আমরা এসব কিছুর অধিকারী হয়ে থাকি এবং তোমরা এসব থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকো তাহলে তোমরা নিজেরই চিন্তা করে দেখো, এটা কেমন করে সম্ভবপর ছিল যে, আমরা বাতিলের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকেও এভাবে দুনিয়ার মজা লুটে যেতে থাকবো আর তোমরা হকের পথে অগ্রসর হয়েও এ ধরনের ক্লান্তিকর জীবন যাপন করে যেতে থাকবে ? আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আল কাহফ ৩৭-৩৮ টীকা।

أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيٰطِينَ عَلَى الْكٰفِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا ﴿٨٣﴾ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا ﴿٨٤﴾ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمٰنِ وَفْدًا ﴿٨٥﴾ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلٰى جَهَنَّمَ وِرْدًا ﴿٨٦﴾ لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا ﴿٨٧﴾

৬ রুকূ'

তুমি কি দেখো না আমি এ সত্য অস্বীকারকারীদের উপর শয়তানদের ছেড়ে রেখেছি, যারা এদেরকে (সত্য বিরোধিতায়) খুব বেশী করে প্ররোচনা দিচ্ছে ? বেশ, তাহলে এখন এদের উপর আযাব নাযিল করার জন্য অস্থির হয়ো না, আমি এদের দিন গণনা করছি।[৫১] সে দিনটি অচিরেই আসবে যেদিন মুত্তাকীদেরকে মেহমান হিসেবে রহমানের সামনে পেশ করবো। এবং অপরাধীদেরকে পিপাসার্ত পশুর মতো জাহান্নামের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবো। সে সময় যে রহমানের কাছ থেকে পরোয়ানা হাসিল করেছে তার ছাড়া আর কারো সুপারিশ করার ক্ষমতা থাকবে না।[৫২]

৪৬. অর্থাৎ প্রত্যেক পরীক্ষার সময় আল্লাহ তাদেরকে সঠিক সিদ্ধান্ত নেবার এবং সঠিক পথে চলার সুযোগ দান করেন। তাদেরকে অসৎ কাজ ও ভুল-ভ্রান্তি থেকে বাঁচান। তাঁর হেদায়াত ও পথ নির্দেশনার মাধ্যমে তারা অনবরত সত্য-সঠিক পথে এগিয়ে চলে।

৪৭. অর্থাৎ সে বলে, তোমরা আমাকে যতই পথভ্রষ্ট ও দুরাচার বলতে এবং আল্লাহর আযাবের ভয় দেখাতে থাকো না কেন আমি তো আজো তোমাদের চাইতে অনেক বেশী সচ্ছল এবং আগামীতেও আমার প্রতি অনুগ্রহ ধারা বর্ষিত হতে থাকবে। আমার ধন-দৌলত, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও বৈষয়িক ক্ষমতা এবং আমার খ্যাতিমান সন্তানদেরকে দেখো। আমার জীবনের কোথায় তোমরা আমার প্রতি আল্লাহর ক্রোধ ও অভিশাপের চিহ্ন দেখতে পাচ্ছো ?—এটা মক্কার কোনো একজন মাত্র লোকের চিন্তাধারা ছিল না; বরং মক্কার কাফেরদের প্রত্যেক সরদার ও মাতব্বর এ বিকৃত চিন্তায় ভুগছিল।

৪৮. অর্থাৎ তার অপরাধের ফিরিস্তিতে তার এ দাম্ভিক উক্তিও শামিল করা হবে এবং এর মজাও তাকে টের পাইয়ে দেয়া হবে।

৪৯. মূলে عِزًّا শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ তারা এদের জন্য ইজ্জত ও মর্যাদার কারণ হবে। কিন্তু আরবী ভাষায় "ইজ্জত" মানে হচ্ছে কোনো ব্যক্তির এত বেশী শক্তিশালী ও জবরদস্ত হয়ে যাওয়া যার ফলে তার গায়ে কেউ হাত দিতে না পারে। আর এক ব্যক্তির অন্য ব্যক্তির জন্য ইজ্জতের কারণে পরিণত হওয়ার অর্থ এ হয় যে, প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তির এমন সহায়ক হবে যার ফলে তার কোনো বিরোধী তার দিকে চোখ তুলে তাকাতে না পারে।

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا ﴿৮৮﴾ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ﴿৮৯﴾ تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ﴿৯০﴾ أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمٰنِ وَلَدًا ﴿৯১﴾ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمٰنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ﴿৯২﴾ إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا اٰتِي الرَّحْمٰنِ عَبْدًا ﴿৯৩﴾ لَقَدْ أَحْصٰهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ﴿৯৪﴾ وَكُلُّهُمْ اٰتِيهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَرْدًا ﴿৯৫﴾ إِنَّ الَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا ﴿৯৬﴾

তারা বলে, রহমান কাউকে পুত্র গ্রহণ করেছেন—মারাত্মক বাজে কথা যা তোমরা তৈরি করে এনেছো। আকাশ ফেটে পড়ার, পৃথিবী বিদীর্ণ হবার এবং পাহাড় ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে এজন্য যে, লোকেরা রহমানের জন্য সন্তান থাকার দাবী করেছে ! কাউকে সন্তান গ্রহণ করা রহমানের জন্য শোভন নয়। পৃথিবী ও আকাশের মধ্যে যাকিছু আছে সবই তাঁর সামনে বান্দা হিসেবে উপস্থিত হবে। সবাইকে তিনি ঘিরে রেখেছেন এবং তিনি সবাইকে গণনা করে রেখেছেন। সবাই কিয়ামতের দিন একাকী অবস্থায় তাঁর সামনে আসবে।

নিসন্দেহে যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করছে শীঘ্রই রহমান তাদের জন্য অন্তরে ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেবেন।[৫৩]

৫০. অর্থাৎ তারা বলবে, আমরা কখনো এদেরকে বলিনি আমাদের ইবাদাত করো এবং এ আহম্মকের দল যে আমাদের ইবাদাত করছে তাও তো আমরা জানতাম না।

৫১. এর মানে হচ্ছে, এদের বাড়াবাড়ির কারণে তোমরা বে-সবর হয়ো না। এদের দুর্ভাগ্য ঘনিয়ে এসেছে। পাত্র প্রায় ভরে উঠেছে। আল্লাহর দেয়া অবকাশের মাত্র আর কদিন বাকি আছে। এ দিনগুলো পূর্ণ হতে দাও।

৫২. অর্থাৎ যে পরোয়ানা হাসিল করে নিয়েছে তার পক্ষেই সুপারিশ হবে এবং যে পরোয়ানা পেয়েছে সে-ই সুপারিশ করতে পারবে। আয়াতের শব্দগুলো দু'দিকেই সমানভাবে আলোকপাত করে।

সুপারিশ কেবলমাত্র তার পক্ষেই হতে পারবে, যে রহমান থেকে পরোয়ানা হাসিল করে নিয়েছে, একথার অর্থ হচ্ছে এই যে, যে ব্যক্তি দুনিয়ায় ঈমান এনে এবং আল্লাহর সাথে কিছু সম্পর্ক স্থাপন করে নিজেকে আল্লাহর ক্ষমার হকদার বানিয়ে নিয়েছে একমাত্র তার পক্ষেই

فَإِنَّمَا يَسَّرْنَٰهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ ٱلْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِۦ قَوْمًا لُّدًّا ﴿٩٧﴾ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ﴿٩٨﴾

বস্তুত হে মুহাম্মাদ! এ বাণীকে আমি সহজ করে তোমার ভাষায় এজন্য নাযিল করেছি যাতে তুমি মুত্তাকীদেরকে সুখবর দিতে ও হঠকারীদেরকে ভয় দেখাতে পারো। এদের পূর্বে আমি কত জাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছি। আজ কি কোথাও তাদের নাম-নিশানা দেখতে পাও অথবা কোথাও শুনতে পাও তাদের ক্ষীণতম আওয়াজ ?

সুপারিশ হবে। আর সুপারিশ একমাত্র সে-ই করতে পারবে যে পরোয়ানা লাভ করবে, একথার অর্থ হচ্ছে এই যে, লোকেরা যাদেরকে নিজেদের সুপারিশকারী মনে করে নিয়েছে তাদের সুপারিশ করার ক্ষমতা থাকবে না ; বরং আল্লাহ নিজেই যাদেরকে অনুমতি দেবেন একমাত্র তারাই সুপারিশ করার জন্য মুখ খুলবেন।

৫৩. অর্থাৎ আজ মক্কার পথেঘাটে তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করা হচ্ছে। কিন্তু এ অবস্থা দীর্ঘস্থায়ী নয়। সে সময় নিকটবর্তী যখন তারা সৎকাজ ও উন্নত নৈতিক চরিত্রের জন্য জনপ্রিয় হয়ে উঠবেই। মানুষের মন তাদের প্রতি আকৃষ্ট হবে। দুনিয়াবাসী তাদের পথে ফুল বিছিয়ে দেবে। আল্লাহদ্রোহিতা, পাপ, অশ্লীলতা, ঔদ্ধত্য, অহংকার, মিথ্যা ও লোক দেখানো কার্যকলাপের ভিত্তিতে যে নেতৃত্ব এগিয়ে চলে তা মানুষের মাথা নত করাতে পারে কিন্তু হৃদয় জয় করতে পারে না। অপরদিকে যারা সত্য, ন্যায়নীতি, বিশ্বস্ততা, আন্তরিকতা ও সদাচার সহকারে সত্য-সঠিক পথের দিকে মানুষকে আহ্বান জানাতে থাকে, দুনিয়াবাসী প্রথম প্রথম তাদের প্রতি যতই বিরূপ থাকুক না কেন শেষ পর্যন্ত তারা মানুষের মন জয় করে নেয় এবং অবিশ্বস্ত ও পাপাচারীদের মিথ্যা বেশীক্ষণ তাদের পথ রোধ করতে পারে না।

❑